দামোদরের মেয়ে

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বুকডিপো লিঃ
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীভূপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ

কলিকাতা বুকডিপো লিঃ

২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed by

B. N. CHATTERJEE

At the

Kusumika Press.

52/7, Bowbazar Street, Calcutta.

উৎসর্গ-পত্র

পরম প্রীতিভাজন,

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল

পি-এইচ-ডি।

প্রিয়বর,

আপনার ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনা, আপনার অপূর্ব্ব বিনয় প্রথম পরিচয়ের শুভ দিন হইতে একটা অবিচ্ছিন্ন আনন্দ আবেশের মধ্যে এমন ভাবে আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে যে, তাহা প্রকাশের পথ এত দিন ভাবিয়া খুঁজিয়া পাই নি।

দামোদরের মেয়ে বন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছে, সে অজ্ঞাতকুলশীলা; সুতরাং এই আশ্রয়হীনাকে আপনার নিরাপদ আশ্রয়ে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এবং আপনার পরিচয়কে আমার অন্তরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলাম।

আমার এই ক্ষুদ্র উপহার—অতি সামান্য হইলেও লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্রের আনন্দ আবেষ্টনের মধ্যে যে অনাদর পাইবে না, এমন ভরসা প্রথম পরিচয়েই আপনি দিয়াছেন।

মহালয়া
৮ই আশ্বিন, ১৩৩৪

নিত্য-শুভানুধ্যায়ী
শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'প্রবাসী কুটির'
কুণ্ডা, দেওঘর, ই, আই, আর

উপহার

সূচী

দামোদরের মেয়ে

(১)
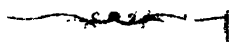
সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই গ্রামবাসীর অন্তর দুর্বিসহ চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। একজন যুবক হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সহস্র চেষ্টাতেও কোন মতে বাঁধ রক্ষা করিতে পারা গেল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকণ্ঠিত গ্রামবাসী সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া আকুল আগ্রহে যুবকের কথা এতক্ষণ শুনিতেছিল। এখন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া মাথায় হাত দিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। তাহাদের নয়নের সম্মুখে সারা সংসার মুহূর্ত্তে মসীবর্ণ অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, আর বিলম্ব নাই। ঐ বুঝি প্রবল বন্যা ভৈরব বেগে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে আত্মসাৎ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সহসা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ গর্জ্জন সকলের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—প্রিয় পরিজনের মৃত্যুর ম্লান মুখচ্ছায়া তাহাদের আত্মহারা করিল। সকলেই যে যার গৃহাভিমুখে রুদ্ধশ্বাসে শেষ বাধাটুকু দিবার জন্য ছুটিল। কেহ কাহারও সাহায্য করিবার অবসর পাইল না, কেহ কাহারও খোঁজ রাখিবার অবকাশ পাইল না, সে কি ভীষণ শ্রবণ-বধির দামোদরের গর্জ্জন!

যেন নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের আনন্দ-অধীর-দেহ-ভঙ্গীর ভীষণ শব্দ! দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে জল প্রবেশ করিল। পুষ্করিণী, তড়াগ, মাঠ সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া, ক্রমে জল পথে উঠিয়া দাড়াইল। এই থৈ থৈ ভাব দেখিয়া আসন্ন মরণোন্মুখ গ্রামবাসী যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বিপন্নের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জল মাপিতে আরম্ভ করিল। সহসা আর একটা ভয়ঙ্কর পর্ব্বত পতনের মত শব্দ শ্রুত হইল। যাহারা ক্ষীণ আশা অবলম্বন করিয়া এতক্ষণ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া জল মাপিতেছিল তাহারা আশা ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর রক্ষা নাই! আর এক জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।" মুহূর্ত্তে জল পথ ছাড়িয়া গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তারপর সে বর্ণনা ভাষায় করা যায় না, চক্ষুতে দেখা যায় না, কর্ণে শুনিতে পারা যায় না; যার যাহা ছিল, নিষ্ঠুর দামোদর সব টানিয়া লইয়া গেল। জননীর স্নেহপূর্ণবক্ষ হইতে তার প্রাণ-প্রিয় সন্তান কাড়িয়া লইল। সতী স্ত্রীর প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ বাহুলতা বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীকে কাড়াইয়া লইল। অত্যাচারেব চরম পীড়নে বড় বড় গৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া সাগর-দরবারে, রণ-দৃপ্ত জয়োল্লাসে, উন্মত্ত দামোদর অট্টহাস্যে নাচিয়া চলিল। ধ্বংস-লীলায় প্রমত্ত দামোদর স্নেহহীন দামোদর, মমতা বিহীন দামোদর, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের যথা সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া চলিল। এ অত্যাচারের প্রতীকার করিতে কাহারও শক্তি বা অনুনয় কোন প্রয়োজনেই লাগিল না। এক দিনে, কয়েক ঘণ্টায়, যাহা কেহ কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, তাহাই ঘটিয়া গেল। রোগে নয়, শোকে নয়, দুর্ভিক্ষে নয়, শত শত লোক গৃহ-হারা, পুত্র-হারা, আত্মীয়-হারা সম্পদ-হারা হইল। দামোদরের জল পর দিন কমিয়া গেল। কিন্তু গ্রাম-বাসীর নয়নজল প্রতি-দিন বাড়িয়া চলিল।

(২)

প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। বন্যাভয়ে তাহাদের ভদ্রাসন অপেক্ষাকৃত উঁচু। কিন্তু উদ্দাম দামোদরের ছোট, বড়, উঁচু, নীচু এ সব ব্যবধান কোন দিনই মানিয়া চলা অভ্যাস নয়। সে দিন জমিদারের শয়ন-গৃহে জল প্রবেশ করিয়াছিল। ধানের গোলা, গরু, বাছুর, জিনিষ পত্র, যাহা পাইয়াছিল, সে তাহা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অসীম শক্তিশালী জমীদার নিরুপায় কাঙ্গালের মত করুণ-কাতর দৃষ্টিতে কেবল চাহিয়াছিল।

পর দিন ধীরে ধীরে জলোচ্ছ্বাস হ্রাস পাইয়া আসিল। যাহারা কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহাদের মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দনে, সারা গ্রামখানি বিষাদে ভরিয়া গেল। এ বিপদ একজনের নয়, দুইজনের নয়, সকলের ঘটিয়াছে; সুতরাং কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? কে কাহার নয়ন-জল মুছাইবে? কে কাহার সাহায্য করিবে? বেলা আন্দাজ একটার সময় প্রফুল্লকুমার সহসা শুনিতে পাইল, যেন একটী অত্যন্ত শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাহার বহির্ব্বাটীর উচ্চ মাচার উপর হইতে আসিতেছে। অতীব সতর্কতার সহিত সে দিকে, কান দিবামাত্র, পুনরায় সেই স্বর তাহার কানে আসিল। মনে হইল, বুঝি শিশু তার শরীরের সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি সঞ্চিত করিয়া শেষ সাড়া দিয়া প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছে। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রফুল্লকুমার মাচার উপর গিয়া উঠিলেন। বন্যা-বিতাড়িত একটী সুন্দর কন্যাকে তদাবস্থায় দেখিতে পাইয়া, তখনই উহাকে স্ত্রীর নিকট লইয়া গেলেন ও গরম দুগ্ধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গৃহে ব্রাণ্ডি ছিল, উহার দ্বারা তাহার

সর্ব্বাঙ্গ মালিশ করিয়া দিলেন। অনুমানে মনে হইল, শিশুকন্যা এখনও পৃথিবীর ষষ্ঠচন্দ্র দর্শন করিবার বয়স প্রাপ্ত হয় নাই। সে গৃহের চারিদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিতেছিল। তাহার নিষ্কলঙ্ক ক্ষুদ্র মুখখানির উপরে হর্ষ-বিষাদের কোন ভাবই নাই। দুধ খাইবার পর একটুখানি আপন মনে খেলা করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রফুল্লকুমার এতক্ষণ একখানি 'চেয়ারে' বসিয়া একমনে ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া এই ক্ষুদ্র শিশু প্রবল বন্যার ভীষণ তাণ্ডবলীলা সহ্য করিয়া এই মাচার উপর স্থান পাইল? ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র হৃদযন্ত্র নিস্তব্ধ হইয়া গেল না? সে এক বিন্দু জল খাইল না, কোথাও কি সে কোন প্রকার আঘাত পাইল না? জলের মধ্যে সে ডুবিয়া মরিল না? কোথা হইতে সে যে ভাসিয়া আসিয়াছে, কে বলিতে পারে? সন্তরণ-নিপুণ ব্যক্তিগণও যে, ভয়ঙ্কর স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া প্রাণহারায় সেই স্রোতে এই আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ শিশু, কি করিয়া অনায়াসে নিরাপদ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল? যাহারা চেষ্টা করিবার সামর্থ্য লইয়া আসিয়াছিল, তাহারাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইল। আর যাহাদের চেষ্টা করিবার কোন সামর্থ্যও নাই, তাহারাই অনায়াসে বাঁচিয়া গেল। যাহা স্বপ্নেও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহাই সত্য ও সম্ভব হইল। এ বিচিত্র-রহস্যের উত্তর কোথায়? কে জানে?

প্রফুল্লকুমার দর্শন শাস্ত্রে এম্-এ। তিনি এ বিষয়ে, যত চিন্তা করিতে লাগিলেন, তত তাহার চিন্তার সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল ;—চিন্তার প্রথম খিয়া গাছটী কোথায় যে তিনি হারাইয়া ফেলিলেন, তাহার সন্ধান করিতে গিয়া তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে হেমলতা বলিল, "ভগবান যাকে রক্ষা করেন, কে তাকে মারতে পারে?"

প্রফুল্লকুমার একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তিনি যেন চিন্তার অকুল সমুদ্রে একটা অবলম্বন পাইয়া কুলের আশায় বলিলেন, "এ কথা একশ বার ঠিক। এই ক্ষুদ্র শিশু বাপ-মার স্নেহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এলেও ভগবান্ তাকে তাঁর নিজ কোলে তুলে নিয়েছেন, সে বিষয় সন্দেহের কোন কারণ নাই। দেখ লতা, আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ব'ল্‌তে হবে। ভগবান নিজে হাতে ক'রে এমন সুন্দর কন্যা দান করেছেন। মেয়েটির মুখ খানি দেখে পর্য্যন্ত আমার বড় মায়া হ'য়েছে। যেন স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ।"

"মেয়েটী যে বামুন কায়েতের হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। তা ছাড়া মনে হয় বড় লোকের মেয়ে। নইলে এত ছোট মেয়ের হাতে সোনার বালা থাক্‌ত না। বালা দুগাছি বেশ সুন্দর ও নিরেট বলে মনে হয়।"

প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠলেন, "কি বল্লে!" হাতে সোনার বালা আছে না কি? কৈ আমার নজরে পড়েনি ত!"

"শুধু বালা কেন, গলায় এক গাছা সুন্দর গোট হার আছে। নিশ্চয় বড় ঘরের মেয়ে। আজ নয় কাল, দু'দিন পরেই যার মেয়ে সে এসে নিয়ে যাবে।"

"যাদের মেয়ে তারা যদি সংবাদ পেয়ে নিয়ে যায়, তার চেয়ে আর বেশী আনন্দ কি হতে পারে লতা? তাদের বেদনা-কাতর বুকের নিধিকে যদি আমি তাদের বুকে তুলে দিতে পারি—এমন দিন কি আমার হবে? এত বড় সৌভাগ্য কি আমার হবে যে, সন্তানহারা, উন্মাদিনী জননীর স্নেহকরুণ-বক্ষনীড়ে তার হারানিধিকে ফিরিয়ে দিতে পারব!" বলিতে বলিতে প্রফুল্লকুমারের নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তিনি একদৃষ্টিতে

শয্যাশায়িত কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া তার রোরুদ্যমানা জনক-জননীর কাতর মুখ, যেন নয়ন সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।

(৩)

তার পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া কত লোক কত আশা বুকে করিয়া প্রফুল্লকুমারের বাড়ী কন্যা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আসিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, অশ্রুবিগলিত নয়নে ফিরিয়া গিয়াছে। কত জননী পাগলিনী প্রায় আসিয়া হতাশ অন্তরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অজ্ঞাত-কুলশীলা কন্যা কোন্ অভাগিনী জননীকে চির-বিষাদে নিমগ্ন করিয়া আসিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান হইল না। প্রফুল্লকুমার নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী অনেক গ্রামে ঢেঁড়া দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তাহার গৃহে একটী শিশু কন্যা ভাসিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। জনতা বাড়িল, কত শত সন্তান-হারা জনক-জননী বিপুল আশা বক্ষে লইয়া আসিল ও চলিয়া গেল। শিশু কন্যা সহাস্যমুখে হাত-পা ছুড়িয়া সকলের অভ্যর্থনা করিল বটে, সকলে এক একবার তাকে কোলে তুলিয়া, আদর করিয়া জনকজননী-হারা বন্যা-বিতাড়িত কন্যাকে তাহাদের উত্তপ্ত বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল সত্য, কিন্তু কেহ তাকে নিজ কন্যা বলিতে পারিল না। বরং কন্যার অজ্ঞাত পিতামাতার জন্য সমবেদনার অশ্রু ফেলিয়া দুঃখভারপীড়িত কাতর অন্তরে চলিয়া গেল, অগত্যা কন্যা প্রফুল্লকুমারের স্নেহ বেষ্টনীর মধুর স্পর্শের মধ্যে রহিয়া গেল।

হেমলতার কন্যা ছিল না। তাহার দুইটী মাত্র পুত্র; একটীর বয়স

মাত্র দুই বৎসর, অপরটীর পাঁচ উত্তীর্ণ হইয়া ছয়ে পড়েছে। কন্যাটাকে পাইয়া তিনি মাতৃস্নেহে তাকে অভিসিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

শরতের সন্ধ্যা। পূজার পনর কুড়ি দিন তখনও বাকী আছে। পশ্চিম গগন-প্রান্তে গলিত স্বর্ণের উজ্জ্বল রশ্মি তখনও বিলীন হইয়া যায় নাই। কাল কাল গাছের মাথার উপর যেন একটী অপরূপ সুবর্ণ-বন্যা আসিয়া লাগিয়াছে, মধুর স্নিগ্ধ বাতাস সমস্ত অঙ্গে লাগিয়া এক অপূর্ব্ব পুলক শিহরণে মন ও প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল। প্রফুল্লকুমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা লইয়া দামোদরের বাঁধের উপর হইতে বেড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন।

স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "লতা, আজকে-কার দামোদরকে দেখে কি সে দিনকার কথা মনে পড়ে? সে দিন গ্রামের কত লোকের গরু মহিষ এই দামোদর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? ওঃ! সে দিনের কথা স্মরণ করতে যেন শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে আসে।"

হেমলতা কন্যা হিমানীকে বক্ষের মধ্যে স্নেহভরে চাপিয়া ধরিয়া তার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "সে দিনের কথা কি ভোলা যায়! সে দিন, যে আমাদের পক্ষে বড় আনন্দের দিন। হিমানী যে সে দিন সাগর-ছেঁচা লক্ষ্মীর মত আমাদের কাছে এসেচে।" তার পর আর একবার তার মুখখানি আবেগ ভরে চুম্বন ক'রে বল্লে, "কি বলিস্ মা হিমানী? আমি কি সে আগমনীর দিন জীবনে বিস্মৃত হোতে পারি?"

"তুমি পার না, আর আমি বুঝি পারি, মনে করচ। হিমানী যে দিন থেকে আমাদের সংসারে এসেচে, সে দিন থেকে নানা দিক দিয়ে আমাদের উন্নতি দেখা দিয়েছে তা জান? কিন্তু আমার বড় ভয় করে, যদি এমন হয় যে হিমানীর বাপ-মা, এসে তাদের মেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়?"

"আমি বল্‌চি হিমানী আর আমাদের ছেড়ে যেতে পার্‌বে না।—"

"তারা যদি জোর করে কেড়ে নিয়ে যেতে চায় তা হ'লে ত আমি বাধা দিতে পার্‌ব না। তখন কি হবে? অস্বীকার করার পথ নাই। সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, মেয়ে আমাদের কাছে আছে।"

"তারা আর আস্‌চে! আস্‌বার হ'লে এই তিন বছরের ভিতর কোন দিন আস্‌ত। এখন এলে কিন্তু হিমানীকে আমি ছেড়ে দিতে পার্‌ব না, তা বলে রাখ্‌ছি। তাতে যা হবার তা হবে"।

"কি প্রমাণ তারা দেখাতে পার্‌বে যে এ মেয়ে তাদের হারান মেয়ে? একরত্তি রক্তের ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে এত ক'রে মানুষ কল্লাম, আজ কি না এক কথায় ফিরিয়ে দেব? তা কিছুতেই হবে না।" বলিয়া হিমানীর সহাস্য-সুন্দর মুখখানি হেমলতা চুম্বন করিলেন।

এখন হিমানী হেমলতার কোল হইতে দুই খানি ক্ষুদ্র বাহু প্রসারিত করিয়া প্রফুল্লকুমারের কোলে যাইল এবং হাত-পা নাড়িয়া আধ আধ স্বরে সে জানাইল, তাকে যেন আর কাহাকেও দেওয়া না হয়। এমনি করিয়া হিমানী, হেমলতা ও প্রফুল্লকুমারকে ধীরে ধীরে তাহাদের অজ্ঞাতে যে মায়ার শৃঙ্খল পরাইতেছিল—তাহা যে লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষা কত মজবুত, তা হয় ত তখন তাহারা বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহারা বেড়াইয়া গৃহে ফিরিলেন—এখন হিমানীর ভবিষ্যৎ-চিন্তাই তাহাদের প্রধান আলোচ্য-বিষয় হইল।

প্রফুল্লকুমার হিমানীকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লতা! তুমি হিমানীকে ছেড়ে থাকৃতে পার্‌বে না বল্‌চ, কিন্তু হিমানী চির দিন

তোমার নিকট ত এমন ছোট্টটী হোয়ে থাক্‌বে না। যখন সে শ্বশুরবাড়ী যাবে তখন ত আর ও কথা চল্‌বে না?

"তখনকার কথা তখন দেখা যাবে। অনেকে ত ঘরজামাই ক'রে রাখে। আমিও না হয় তাই কর্‌ব।"

"এতটা ক'রতে পার্‌বে? তা' হ'লে সত্যই তুমি হিমানীকে নিজের গর্ভজাত মেয়ের মতই ভালবাস।"

হেমলতা স্বামীর কথায় নিজ স্নেহের উপর স্বামীকে সন্দিহান জানিয়া অভিমান-সূচক স্বরে বলিলেন, "আমি কি আর ভালবাসি? ও-কাজটা তোমাদের একচেটিয়া। তোমরা যা কর, তা সবই অসাধারণ! তোমাদের ভালবাসা, মোহ‌মায়া, জাল হবার কোন আশঙ্কা নাই।"

প্রফুল্লকুমার সস্নেহে হেমলতার হাতখানি নিজ হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি রাগ ক'র্‌লে? তুমি যে হিমানীকে কতখানি ভালবাস তা কি আমি জানি না? তোমাকে রাগাবার জন্য এই সব কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিন্তু তা মোটেই বুঝ্‌তে পার না দেখ্‌চি।"

হিমানীকে অবলম্বন করিয়া খুঁটি নাটি ব্যাপারে কত দিন এই দম্পতীর প্রেম ও কলহ ঘটিত, কিন্তু শেষে একটা মধুর আনন্দ মিলনে আপোষ হইয়া যাইত।

(৪)

মানুষ যেমনটী মনে করে, কাজে কোন দিন ঠিক তেমনটী হয় না। সুতরাং প্রফুল্লকুমার এত দিন ধরিয়া যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কার্য্যকালে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া বসিল।

বন্যায় যে দিন হিমানী ভাসিয়া আসিয়াছিল, সে দিন প্রফুল্লকুমারের চিন্তা হইয়াছিল, কেমন করিয়া এই বিপন্না অসহায়া মেয়েটিকে তার মাতৃ-বক্ষে তুলিয়া দিবে। তার পর হিমানী যখন তার মধুময় শিশু-হৃদয় দিয়া তাহাদের নিকট পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ ভিক্ষা লইল, তখন আশঙ্কা হইল পাছে হিমানীকে কোন দিন তার পিতামাতা আসিয়া লইয়া যায়। এখন হিমানী চতুর্দ্দশ বর্ষে নবোদ্ভিন্ন রূপ-লাবণ্য লইয়া নারী জীবনের পূর্ণতা দাবী করিয়া সংসার ও সমাজের দুয়ারে আসিয়া সমুপস্থিত। এমন অবস্থায় আর কত দিন তাকে সংসারের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়?

আজ হিমানী যদি হেমলতার গর্ভজাত কন্যা হইত? হিন্দু ঘরের মধ্যে তাকে অবিবাহিত রাখার বিপক্ষে, তাহা হইলে হেমলতা প্রতি দিন স্বামীর নিকট সহস্র যুক্তি দেখাইত এবং কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু প্রফুল্লকুমার দেখিল, স্নেহ করা খুব সহজ; কিন্তু স্নেহের দাবী পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কত দিন হেমলতা, হিমানীকে সে কতখানি ভালবাসে তাহা লইয়া তাহার সহিত কলহ করিয়াছে। তাহার স্নেহ ও ভালবাসা তাহার স্বামীর চেয়ে যে অনেক বেশী, এমন কথা বলিতেও ছাড়ে নাই। প্রফুল্লকুমারের মনে পড়িল এক দিন হেমলতা হিমানীকে শশুরবাড়ী পাঠাইবার আশঙ্কায়, তার বিবাহ দিয়া "ঘর-জামাই" রাখিবে এমন কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। আর আজ তার বিবাহের কথা ভুলিয়া একবারও মুখে আনে না; বরং সে কথা তুলিলে সে সেখান হইতে চলিয়া যায়, পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলে, এ কথায় আমি থাকৃতে পারব না, যার

জাতকুল কিছু জানা নাই, তার বিবাহ কেমন করিয়া হতে পারে? আমি কারও কুল মজাতে পারিব না। ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করি, শেষে কি একটা অভিশাপে পড়ে যাব? তাহার কথা শুনিয়া আমি ত একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

হিমানীকে লইয়া প্রফুল্লকুমার দেখিল এক মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। সকল মানুষের মধ্যেই কম বেশী দুর্ব্বলতা আছে; সুতরাং প্রফুল্লকুমারও সে দুর্ব্বলতার হাত এড়াইতে না পারিয়া ভাবিতেন, হেমলতার কথা ত একেবারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কেহ হিমানীর বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? ইহারা কি জাতি তাহাও ত বলিতে পারিব না। যদি হিমানীর বিবাহ দিতে না পারি, তাহা হইলে তাহার জীবন যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে হিমানীকে এত অর্থ ব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া, তাহাকে বাঁচাইলাম কি সমাজের অত্যাচারের হাতে বিড়ম্বিত করিবার নিমিত্ত! এ জীবনদান যে মরণ অপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্রদ। তবে কি একে—দামোদরের গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিব? এমন অবস্থায় হিমানীকে যে আর অধিক দিন গৃহে রাখিতে পারিব না। কি কুটিল শ্লেষভরা ঐ দেশবাসীদের দৃষ্টি! অসহ্য! যত টাকা ব্যয় হয় করিব। হিমানীকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিবই দিব।

এমন সময়ে হিমানী সেখানে আসিয়া প্রফুল্লকুমারের হাতে কতকগুলি পত্র ও সংবাদপত্র দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র প্রফুল্লকুমার ডাকিলেন, "হিমানী এই নিয়ে যা তোর, 'মানসী' এসেচে।"

হিমানী আগ্রহ ভরে মানসী খানি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "বাবা, আপনি পড়েছেন কি গত মাসের কাগজে একটা ভারি সুন্দর গল্প ছিল।"

চিঠি পড়িতে পড়িতে প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "কার লেখা ?"

"তা কেন বলব। নাম দেখে গল্প পড়লে কোন মজাই পাওয়া যায় না।"

"কেন ?"

"নামজাদা লেখকের গল্প গুলিই পড়া যায়, আর বাকীগুলা ভাল কি মন্দ তা পড়বার অবকাশ হয় না। এটা আমাব মনে হয় বড় অন্যায়। যাদের নাম পরিচিত নয় বা জানা নাই, তাদের উপেক্ষা করলে সত্যই অনেক সময় খুবই ঠকতে হয়।"

"আচ্ছা, আজ বিকালে সে গল্পটা পড়ে শোনাস্। এখন একবার তোর মাকে এখানে ডেকে দিস্। বলিস, বিশেষ দরকার।"

একরাশ কাল চুল দোলাইয়া মহা আনন্দে সরল হৃদয়ে হিমানী, উৎফুল্ল অন্তরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, আজ বৈকালে গল্পটা পড়িয়া শুনাইব। কিন্তু কিছুতেই কার লেখা বলব্ না। দেখি, বাবা গল্পটার কি সমালোচনা করেন। পরক্ষণেই সহসা তার মনে হইল আচ্ছা, সংসারে যাদের পরিচয় নাই—তাদের সর্ব্বস্ব থাকিলেও বুঝি কিছু নাই। তাই বুঝি মহাবীর কর্ণ অস্ত্র পরীক্ষার দিন দ্রোণাচার্য্যের নিকট হ'তে পরীক্ষা দিবার অনুমতি পান নাই। কথাটা মনে করিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার পর তার মনে হইল, যদি সমাজের নিকট মানুষের বাহিরের পরিচয় বড না থাকে, তাহা হইলে তার অন্তর,

স্নেহ, ভালবাসা, প্রণয়, শিক্ষা এ সকলের মূল্য কি কিছু নাই! ভ্রান্ত মানব বাহিরের দিক্ দিয়াই মানুষের বিচার করে।

(৫)

"দেখ লতা হিমানীর সম্বন্ধে এখন এতটা উদাসীন হ'লে কিছুতেই চল্‌তে পারে না। যারা তার বন্যায় ভেসে আসার কথা জানে না, তারা সকলেই জানে হিমানী আমাদের মেয়ে। এখন যদি সেই পুরাতন ইতিহাস তুলে সে আমাদের মেয়ে নয় এ কথাটা প্রকাশ করে দিই, তবে যেন সে অপমান হিমানীর অপেক্ষা আমাদেরই অধিক। হিমানীকে তুমি তোমার ছেলেদের সঙ্গে এতটুকু ভিন্ন কোনও দিন দেখ নাই, সে সমানে তোমার স্তন্যপান করে বেঁচে ও বেড়ে উঠেছে; এ কথা তুমি কোন প্রকারে অস্বীকার কর্‌তে পার না। তুমি তার প্রকৃত জননী। হিমানী তোমারই পালিত কন্যা। সুতরাং সে ব্রাহ্মণের কন্যা। তার বিবাহ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দিতে কোনও আপত্তি নাই। তারপর, ভেবে দেখ সে যখন তোমার কোলে এসে আশ্রয় লয়, তখন তার বয়স কি? তখন সংসারের কোন সংস্কার বা জাত তাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে নাই। সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বাড়ীতে লালিত-পালিত। এখন কার সাধ্য তাকে ব্রাহ্মণ কন্যা নয় বল্‌তে পারে? বা সাহস করে?"

হেমলতা ধীরে ধীরে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলেচি, তার জন্ম-রহস্য গোপন করে বিবাহে মত দিতে পার্‌ব না। তাকে চির দিন আমাদের নিকট কন্যার মতই রাখ্‌ব, কিন্তু অন্য কাহাকেও প্রতারিত কর্‌তে পার্‌ব না।"

"তুমি আমার একটা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দাও, কিছুমাত্র তোমার মনের ভাব গোপন করো না। তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌তে পার হিমানী বামুনের মেয়ে নয় ?"

"না তা পারি না।"

"তবে সে কোন জাতের মেয়ে ? তার গায়ে কি তার কোন জাত লেখা আছে ?"

"না তাও লেখা নাই।"

"যদি তা লেখা না থাকে, তবে কোন সাহসে তাহাকে বামুনের মেয়ের দাবী থেকে বঞ্চিত কর্‌তে চাচ্ছ ? সারা জীবন তাকে বাড়ীতে বিধবার মত পুষ্‌তে প্রস্তুত আছ ? তার নারী জন্মটা একেবারে ব্যর্থ করে দিতে, সমাজের মুখ চেয়ে এতটুকু কষ্ট অনুভব করচ না। যার জাতি তোমার জানা নাই, আমার জানা নাই, বিশ্বসংসারে কাহারও জানিবার উপায় নাই, তাহাকে কোন যুক্তির বলে তোমাদের সমাজের শাসন অকারণ মান্‌তে বাধ্য কর্‌তে চলেচ ? মনে রেখো এটাও একটা গভীর পাপ ও ভীষণ অন্যায়।"

"সবাই যে তোমার মত মন নিয়ে এ কথার বিচার কর্‌বে, তুমি যা বল্‌বে, তাই যে তারা অভ্রান্ত সত্য বলে স্বীকার ক'রে নেবে, তার প্রমাণ কি ? তুমি কি বল্‌তে পার যে হিমানী বামুনের মেয়ে ?"

"পারি খুব জোর গলায় বল্‌তে পারি—কারণ তার কোন জাত হবার পূর্ব্বেই সে আমাদের ঘরে এসেচে। তখন সে কাহারও অন্ন স্পর্শ করে নাই, তারপর সে তোমার দুধ খেয়ে মানুষ হ'য়েছে। আমরাও তাকে কোন দিন বামুনের মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু মনে করি নি। আজ চ'দ্দো বছর ধরে সে নির্ব্বিবাদে আমাদের নিকট বামুনের মেয়ের সমস্ত অধিকার নিয়ে

জড়িয়ে আছে। তার হাতে অন্ন-ব্যঞ্জন কি আমরা খাই না? বা আমাদের বাড়ী ব্রাহ্মণভোজন যখন হ'য়েছে, তখন কি তাহার হাত দিয়া বামুনের পাতে পরিবেষণ করিতে কোন দিন ইতস্ততঃ করেচ? না বামুনেরা কোন দিন সে কথা তুলে আপত্তি করেচে? চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর দাও।"

"তা করি নি সত্য। কিন্তু, ভুলের ত সংশোধন আছে। ভুল করেচি বলে যে সেটাকে একটা মস্ত প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে হবে, এমন কথা ত নেই। এটা সত্য, যে তার জাত তুমিও জান না, আমিও জানি না।"

"বেশ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি বলেচ, তাকে চির দিন সংসারে রাখ্‌বে। তবে তাকে গৌরবের সঙ্গে রাখ না কেন? তাকে তার নারীজন্মের সার্থকতায় প্রস্ফুটিত হ'তে দাও না কেন? তোমার মেয়ে, এই পরিচয় দিয়ে তাকে সম্মানের দাবী কর্‌বার মত অধিকার তাকে দাও না কেন? এতে তোমারই গৌরব বৃদ্ধি হবে। তোমার জননীত্ব মহিমান্বিত হবে।"

হেমলতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "আমাকে কি করতে বল? আমাকে কি তাকে পেটের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে বিবাহ দিতে বল? আমি তোমার সব কথা রাখ্‌ব, কিন্তু অন্যকে মিথ্যা বলে প্রতারিত করতে পার্‌ব না। তারপর ভেবে দেখ, কোথাকার কে? তার জন্য আমাদের এত মাথা ব্যাথা কেন? বিধাতা যাকে গৃহহারা করেছেন, তাকে তার অদৃষ্টের বশেই চল্‌তে হবে। সকলের ভাগ্যেই যে বিবাহ থাকে, এমন কোন কথা নেই।"

"ভাল তোমার কথাই স্বীকার কর্‌লাম। অন্যকে প্রতারিত কর্‌বার

প্রয়োজন নাই। তুমি হিমানীকে অন্তরের সহিত স্নেহ কর কেমন? এখন এক কাজ করা যাক্, বীরেন তোমার বড় ছেলে, তার সঙ্গে হিমানীর বিবাহ দাও, তা হ'লে ত আর কারও কথা শুন্‌তে হবে না। এ বিবাহে আমি অন্তরের সহিত মত দিচ্চি—কি বল?''

"প্রাণ থাকৃতে আমি এ কাজ করতে পারব না। প্রথম ছেলের বিয়ে দেব কি না একটা অজ্ঞাতকুলশীলা, কুড়ান মেয়ের সঙ্গে! যার তিন কূলে বল্‌তে কেউ নেই! ছেলে কোন দিন শশুরবাড়ী যেতে পারবে না, সাধ-আহ্লাদ কিছু মিট্‌বে না। সে ছেলে বলে কি, তার উপর যা ইচ্ছে তাই করবে? তা আমি হ'তে দেব না। তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েচে না কি?"

"উত্তম! আমি তোমাকে আর কোন কথা বল্‌তে চাই না।" বলিয়া প্রফুল্লকুমার মর্ম্মস্পর্শী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, স্বার্থের বাহিরে বুঝি মানুষ এক বিন্দু ত্যাগ স্বীকার করিতে কোন দিক্ দিয়া প্রস্তুত নয়? যেমন করিয়া পারি হিমানীকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিব।

(৩)

নির্ঝরিণীর মৃদু তরঙ্গের মত, প্রস্ফুটিত কুসুমের মধু গন্ধের মত, জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোকের মত হিমানী তার ভ্রমরা কালকেশপাশ পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত করিয়া, সরল আনন্দোজ্জ্বল কাল চোখ দুটি পবিত্র স্নেহে পরিপূর্ণ করিয়া প্রফুল্লকুমারের গৃহে প্রবেশ করিল। পিতার চিন্তা-ভারাবনত মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া কন্যা আব্দার ও স্নেহ-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! এখন কি সেই গল্পটা শুন্‌বেন? খুব চমৎকার!"

প্রফুল্লকুমার নির্ব্বাক্ হইয়া বালিকার সরল চিন্তারেখা-শূন্য সুন্দর মুখখানির প্রতি যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে গিয়া মমতায় তার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। হায়! সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা জন্মাবধি পিতামাতার স্নেহ ও ভালবাসাই পাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সে জানে না, তাহাদের অন্তরে কি বিষ লুক্কায়িত আছে! আজ যদি সে গোপন কথা জানিত, তা হ'লে কি আর গল্প শুনাইতে আসিত? প্রফুল্লকুমারকে চিন্তিত ও নির্ব্বাক্ দেখিয়া ভয়-ব্যাকুলা হরিণীর মত সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া রহিল—সাহস সঞ্চার করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বাবা! এখন কি ব্যস্ত আছেন? আমি তবে যাই।" বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে, প্রফুল্লকুমার তার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "দেখ হিমানী তোর গল্প কাল সকালে বেশ ভাল ক'রে শুনব। এখন কতকগুলো জরুরী চিঠির জবাব দিতে হবে কি না, বুঝ্‌লি?"

"গল্পটা যে, কি সুন্দর লিখ্‌চে, তা বল্‌তে পারি না—দেখ্‌বেন এমন গল্প অনেক দিন পড়েন নি।"

প্রফুল্লকুমার এক গাল হাসিয়া বলিল, "তুই দেখ্‌চি এক জন বড় দরের সমালোচক হয়েচিস্। কাল সকালে যেন আমাকে গল্পটা শুনাতে ভুলিস নি।"

"কাল সকালে কোন জরুরী কাজ হাতে রাখ্‌বেন না—এখন থেকে বলে রাখ্‌চি।" বলিয়া হিমানী চলিয়া গেল।

প্রফুল্লকুমার একদৃষ্টে এই গৃহহারা অভাগিনীর অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অনেকগুলি চিঠি পড়িলেন, তাহার মধ্যে যে কয়খানির সহিত আলোক-চিত্র ছিল, সেগুলিকে বাছিয়া আলাদা

করিয়া টেবিলের এক পার্শ্বে উত্তর দিবার জন্য রাখিলেন। একে একে পত্র গুলির উত্তর লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলেন, এ সব পত্রের উত্তরের কথা কেহ জানিল না। আজ কয়েক দিন হইল পাত্রের জন্য সংবাদ পত্রে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই গুলি হিমানীর বিবাহের জন্য পাত্র-সন্ধানের পত্র। ভিতরে ভিতরে প্রফুল্লকুমার হিমানীর বিবাহের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেছিলেন।

হিমানীর ফটো ও তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী দেখিয়া ও পড়িয়া অনেক শিক্ষিত বড় ঘরের ব্রাহ্মণকুমার হিমানীর পাণিগ্রহণ করিতে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহাদের সকলকে প্রফুল্লকুমার উত্তর দিলেন, যে ৪২ নং গ্রে ষ্ট্রীটে শীঘ্র আমি কন্যাকে লইয়া যাইব এবং আপনাদের পুনরায় পত্র দিলে তখন আসিয়া কন্যা দেখিয়া যাইবেন।

হিমানী প্রফুল্লকুমারকে যে গল্পটী শুনাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল—সে গল্পটী, প্রফুল্লকুমার ইতিপূর্ব্বেই পড়িয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটী বালিকা চিরকুমারী থাকিয়া ডাক্তারী শিখিয়া চির-জীবন দীন-দরিদ্রের উপকারে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সে জীবনে কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হয় নাই।

হিমানীকে প্রফুল্লকুমার মাষ্টার রাখিয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। নিজেও অনেক সময় ভাল ভাল বই পড়াইয়া তাহার মনের বিকাশের সহায়তা করিতেন। সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং খুব সংযত মেয়ে। সহজে এমন মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। হিমানী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে এখন এই সংসারের একটা আপদ ও জঞ্জাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এ ধারণা সে কোন দিন তার পিতার ব্যবহারে মনে

করে নাই। তার মাতার ব্যবহার আজকাল তার প্রতি সামান্য দাসীর অপেক্ষা হীন হ'য়ে আসিতেছিল। তিনি ভাল ক'রে বড় কথা বলিতেন না। যেখানে হিমানী থাকিত, সে দিক তিনি মাড়াইতেন না। এমনি একটা অকারণ তাচ্ছিল্য ভাব সর্ব্বদাই সে তার মায়ের ব্যবহারে দেখিতে পাইত। এ সব যত অধিক করিয়া প্রফুল্লকুমারের চক্ষে পড়িতে লাগিল, ততই বেশী করিয়া তাহার অন্তর এই অসহায়া বালিকার ভবিষ্যতের জন্য ভাবিয়া কাতর হইয়া পড়িতেছিল। কেন যে হিমানী তাহাকে এই গল্পটী বিশেষ করিয়া শুনাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। প্রফুল্লকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়ে, যত টাকা ব্যয় করিতে হয় করিয়া হিমানীর সৎপাত্রে বিবাহ দিব।

(৭)

গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীটি প্রফুল্লকুমারের নিজের। খুব বড় বাড়ী। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুসজ্জিত করিয়াছেন। চাকর-বাকর, দাস-দাসীতে গৃহ ভরিয়া গিয়াছে। প্রফুল্লকুমারের ছোট ভগিনী পশ্চিমে থাকিতেন, তিনি এখন এখানে আসিয়াছেন। হিমানী স্নেহময়ী পিসিমাকে পাইয়া অন্তরের ব্যথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। পিসিমা সুবাসিনী, হিমানীকে পাইয়া দিন রাত তাহাকে নানারূপে সজ্জিত করিতে ব্যস্ত। নানাবিধ খাবার তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইতেছেন। পশ্চিমে থাকিয়া যে কত প্রকার খাবার করিতে তিনি শিখিয়াছেন—তাহা হিমানীকে শিখাইতেছেন। প্রফুল্লকুমার হাসিয়া বলিল, "সুবা, তুই দেখ্‌চি হিমানীকে পেয়ে যে সব ভুলে গিয়েছিস ?"

"দাদা, সত্যি তোমার যে এমন মেয়ে হবে তা আমি স্বপ্নেও মনে করতে পারি নি। এখন থেকে বলে রাখ্‌চি হিমানীর বিবাহের পর তাকে আমার ওখানে নিয়ে যাব।"

হিমানী বিবাহের নামে মাথা নীচু করিল। মনে মনে ভাবিল, যেমন দেবতা ভাই, তার উপযুক্ত বোন বটে। সুবাসিনীর আপন-করা মিষ্ট ব্যবহারে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। যেন কত দিনের পরিচিত আত্মীয় বলে তার মনে হ'তে লাগিল। সুবাসিনী হিমানীকে এমন করে তার স্নেহময় বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন যে, সেখান থেকে তার নড়িবার উপায় ছিল না।

প্রায় এক দিন, দুই দিন অন্তর মেয়ে দেখিতে লোক আসিত। সুবাসিনী সুন্দরী হিমানীকে আরো সুন্দর করে সাজাইয়া মেয়ে দেখাইতে পাঠাইত। দরজার পাশে দাঁড়াইয়া, কান পাতিয়া শুনিত, তাহারা কি বলে! সকলের প্রায়ই মেয়ে পছন্দ হইত। কিন্তু প্রফুল্লবাবু নিভৃতে ডাকিয়া যখন তাহাদের নিকট হিমানীর জন্ম-বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিতেন, তখন কেহ কেহ এক-আধটু শুঁই-গাই করিত; কেহ বলিত, আমাদের ও সব আপত্তি কিছুই নাই, কে আর কলিকাতায় ও সব খবর রাখ্‌চে বলুন? আপনি প্রকাশ না কর্‌লেই হ'লো।

প্রফুল্লকুমার ভাবিয়া দেখিলেন, ইহারা আমার অবস্থা ও সুন্দরী মেয়ে এবং টাকার লোভে হিমানীকে বিবাহ করিতে চায়। ইহাতে হিমানীর সম্মান কোন দিক দিয়া নাই। ভোগের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করিয়া হিমানীকে বিবাহ করিতে অনেকে প্রস্তুত—এদের মোটেই চরিত্রবল নাই। কোন দিক দিয়া যদি এ কথা

প্রকাশ হয় বা কোন দিন যদি হিমানীর সহিত মতের মিল না হয়, তখন বামুনের মেয়ে নয় বলিয়া ঘর হইতে ইহাকে তাড়াইয়া দিবে। এবং দু' পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার সমাজ-বক্ষের উপর দম্ভ ভরে তাহারা বিচরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতে মোটেই লজ্জিত হইবে না।

সুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল দাদা? অনেকেই ত মেয়ে দেখে গেল।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "তাদের পছন্দ হ'লে কি হ'বে, আমার একটা পাত্রও মনোমত নয়। এরা লেখাপড়া শিখেছে সত্য, কিন্তু অনেকেই পিতামাতাকে গোপন ক'রে বিবাহ করিতে রাজি। আবার অনেকে টাকার লোভে, মেয়ে সুন্দর দেখে বিবাহ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তারা চায় হিমানী আমার মেয়ে এই কথাই চিরদিন প্রচার রাখতে হবে। এর অর্থ, যদি কোন দিন এ কথা প্রকাশ পায়, তা'হলে তারা তাকে রাস্তায় বের করে দিতে বাধ্য হবে। এত খানি অন্যায় কার্য্য কি আমি জেনে শুনে করতে পারি? যে হিমানীর সমস্ত ঘটনা জেনে, প্রকাশ্যে সে কথা বলে বিবাহ করতে সম্মত হ'বে, তার হাতে হিমানীকে দিব।"

সুবাসিনী বলিল, "তা কিছুতেই হ'তে পাবে না, এমন জামাই আমাদের আবশ্যক নাই।"

এমন সময় বাহির হইতে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "একটী বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।"

প্রফুল্লকুমার তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, একজন কোট-পেণ্টুলন-

ধারী যুবাপুরুষ—গৌরবর্ণ বলিষ্ঠকায়, উন্নত ললাট। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহাকে খুঁজছেন?"

যুবক কোন উত্তর না দিয়া প্রফুল্লকুমারের লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "আপনার নাম কি প্রফুল্লবাবু?"

"আজ্ঞে, আমার নাম।"

"আমি বরাবর ট্রেণ থেকে নেমে এখানে আস্‌চি। আশা করি, আপনার কন্যার বিবাহ হয় নাই।" অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিল।

"না, আজও স্থির করি নাই।"

"আমার পরিচয় ত আপনি অবগত আছেন। লাহোর হ'তে আজ সাত দিন মাত্র দিল্লীতে বদ্‌লী হ'য়ে সেসান-জজ হ'য়ে এসেচি। এক মাসের ছুটীতে আস্‌চি। আমার পিতা সেকেলে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তিনি আমাকে এ বিবাহে অন্তরের সহিত মত দিয়াছেন। আমি বিবাহ করতে৷ প্রস্তুত আছি। আপনার কন্যার বিবাহ যদি অন্য কোথাও ঠিক না হয়ে থাকে, তা'হলে আমি বিবাহ করব।"

"আপনার পিতা অবশ্য সমস্ত কথা শুনেছেন?"

"আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলে লিখিয়াছিলাম এবং আপনার পত্রও তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।"

"আপনার পিতার ও আপনার সৎসাহস দেখিয়া সত্য সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আজ এখানে স্নান-আহার করিয়া মেয়ে দেখিয়া রাত্রে যাইলে ভাল হয় না কি?"

"মেয়ে দেখিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমি সুন্দরী বা বড়

ঘরের মেয়ে বিবাহ করিলে, অনেক ঐশ্বর্য্যবান লোক সেজন্য লালায়িত ছিলেন ও আছেন। কিন্তু জানিবেন, আমি এই মেয়েটীর পরিচয় পাইয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত। সংসারে অকারণ এমন কত জীবন যে ব্যর্থ হইয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে? বাবা আমাকে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ সর্ব্ব জাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারে, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত।"

প্রফুল্লকুমার যুবকের হাত দুটি নিজ হাতের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহভরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি তোমার মত পাত্রই খুঁজ্‌ছিলাম। তোমার হাতে হিমানীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হই।" তারপর তিনি ডাকিলেন, "হিমানী একবার এ দিকে আয় মা!" অন্তরাল হইতে হিমানী সমস্ত কথা শুনিয়াছিল তাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল।

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "ইঁহাকে প্রণাম কর।"

যুবক রূপ-যৌবন-শ্রী-উদ্ভাসিত হিমানীকে দেখিয়া নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর করিতে পারিল না।

কৃতজ্ঞতাভারাবনতা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা দামোদরের মেয়ে হিমানী ভক্তিভরে জীবন-যাত্রার সঙ্গীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

যুবক সেই দিনই বিবাহের ব্যবস্থা করিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

অচেনা

১

মাসটা এখন আর সরোজের ঠিক স্মরণ নেই। সরোজের মা, পুত্রকে ডেকে বল্‌লেন, "ওরে সরোজ—তোর শ্বশুর পত্র দিয়েছেন, এবার পূজার ছুটিতে তিনি তোকে নিয়ে যাবেন।"

সে মার কথার কোন উত্তর দিল না বা কিছুমাত্র হর্ষ বা বিস্ময় প্রকাশ করিল না। মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া শরতের সুনির্ম্মল আকাশের দিকে অনিমেষ নয়নে সে স্থধু চাহিয়া রহিল।

সরোজকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "বেই লিখেছেন, যদি কার্য্যগতিকে তিনি স্বয়ং না আস্‌তে পারেন, তা হ'লে তাঁর অপিসের একজন বাবুকে তোকে নিয়ে যেতে পাঠিয়ে দেবেন। তুই ত কখনো বাইরে যাস নি। রায়গড়—সে না কি অনেক দূর।"

সরোজ তার মার কথার উত্তরে বলিল, "তিনি লিখেছেন বলেই যে, যেতে হবে তার কোন মানে নেই। আমি এবার ছুটিতে আমার একটী বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যাব স্থির করেছি।"

এবার মা যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তা হয় না বাবা সরোজ, তা হয় না। তিন বছর হ'তে চল্লো তোর বিয়ে হয়েছে! বের পর বেহাই তোকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে কত বার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমি যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিনু যে, আই-এস-সি

পাস্‌টা না করলে আমি ছেলেকে পাঠাতে পারব না, তখন তিনি বল্লেন, তবে তাই হবে।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৌ-মা এই ষোল পার হয়ে সতেরয় পা দিয়েছেন। তোকে যেমন পাঠাই নি তাকেও তেমনি আনি নি। আর না গেলে কি চলে? এর পর তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে তোর বন্ধুর বাড়ী আম কাঁটাল খেয়ে আসিস্‌। এবার বৌমাকেও আন্‌তে হবে। আমিও আর একলা বুড়োমানুষ সব কাজ ঠিক সময় মত করে উঠ্‌তে পারি না।"

এবারে কিন্তু সারাজ বলিয়া ফেলিল, "তা তুমি যদি ইচ্ছে করে একলা কর! একটা লোক রাখলেই পার।"

সরোজের জননী একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর কতটা দিনের জন্যেই বা লোক রাখব বল্‌? যার ঘর-সংসার সে এসে বুঝে নেবে—আমার আর ক দিন বল? তা হ'লে, আমি বেয়াইকে চিঠি লিখে দি, যে সরোজই আস্‌বার সময় বৌ-মাকে সঙ্গে করে আন্‌বে।"

সরোজ বলিল, "তা এখন কি করে বল্‌ব বল মা। বন্ধুকে কথা দিয়েছি।"

"হ্যাঁরে সরোজ তুই বলিস কি! আমি আজ তিন বছর আগে তোর শ্বশুরকে কথা দিয়ে রেখেছি। তোর মাকে কি মিথ্যাবাদী করতে চাস—এ বয়সে সেটা বড্ড লাগ্‌বে যে।" বলিতে বলিতে তাঁর নয়ন ছল ছল করিয়া আসিল।

তিনি পুনরায় বলিলেন, "বেশ মনে আছে তুই তখন মাত্র সাত বছরের। পাততাড়ি বগলে করে মধু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়্‌তে

যান। সেই সময় তিনি আমার ঘাড়ে তোর ভার চাপিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর গ্রামবাসীর আত্মীয় স্বজনের যে কি অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে তোকে মানুষ করে এসেছি—তিনি স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ না কর্‌লে, আজ আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত চিহ্নহীন হ'য়ে যেত রে।" বলিয়া তিনি অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিলেন।

জননীর নয়নে অশ্রু দেখিয়া সরোজ বুঝিল, তাহার এরূপ উত্তর দেওয়া কোন রকমে ভাল হয় নাই। সে মনে করিয়াছিল, এমন করিয়া বলিয়া সে তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মূল্য বাড়াইয়া লইবে। প্রথম শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা আছে, সেটার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সরোজ এই বাঁকাপথে আসিয়া পড়িয়াছিল। কথাটা যে এত দূরে গিয়া পড়িতে পারে সংসার-অনভিজ্ঞ, আবাল্য মাতৃ-স্নেহে পরিবর্দ্ধিত সরোজ মোটেই মনে করিতে পারে নাই। মায়ের চক্ষুতে জল দেখিয়া তাহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে কথার স্রোত অন্য দিকে ফিরাইবার অন্য কোন উপায় সম্মুখে না পাইয়া একেবারে শিশুর মত জননীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, "মা, আমি যাব। কিন্তু আমার যে, সেখানে সকলে অচেনা।"

এবার জননীর মুখে আনন্দ-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। পুত্রের কথা শুনিয়া হঠাৎ তার অতীত-জীবনের কি একটা কথা স্মরণ হইল। তিনি সস্নেহে পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুই যে আমাকে অবাক কর্‌লি সরোজ? সেখানে সবাই তোর অচেনা বলিস্ কি রে? তুই কাউকে চিন্‌তে না পার্‌লেও তারা সবাই তোকে চেনে—সেজন্যে তোর কোন ভাবনা নেই।"

সরোজ বলিল, "আর এক কথা। বিয়ের পর তাদের সঙ্গে ত আর আমার কোন দিন দেখা হয় নি। তারা কি আমাকে মনে করে বসে আছে ?"

"ওরে সরোজ তুই জানিস না, তাই তোর মনে অমন কথা আস্‌ছে। এদেশের মেয়ের ভগবান এমন একটী অদ্ভুত শক্তি দিয়েছেন যে, একবার চারি চক্ষুর মিলন হ'লে তারা তা সারা জীবনে ভুল্‌তে পারে না। ফটো-গ্রাফ বা তৈলচিত্র সব হয় ত এক দিন মলিন হয়ে চিন্‌তে না পারা যেতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তরের ছবি উজ্জ্বল থেকে কোন দিন অচেনা হতে পারে না রে।"

স্নেহময়ী জননীর সরল ও সুন্দর কথা শুনিয়া লজ্জায় সরোজের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আর কোন উত্তর দিল না। কল্পনার মোহিনী বিভা, বর্ণ-বৈচিত্র্য-সম্ভারে শত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙ্গীন ছবি সরোজের নয়ন সম্মুখে মুহূর্ত্তের ভিতর অঙ্কিত করিয়া ধরিল। সে অচিন দেশের অচেনা মানুষটির সহিত পরিচয় করিবার জন্য মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

২

সরোজের শ্বশুর অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অফিসের একজন বড় কর্ম্মচারী, সরোজকে লইতে আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে সরোজ কলিকাতার বাহিরে আর কোন দিন যায় নাই। মনে মনে নূতন দেশ ও নূতন লোক দেখিবার আনন্দ হইলেও কেমন

একটা অকারণ চিন্তা ও আশঙ্কা মাঝে মাঝে তাহার আনন্দ-স্রোতে বাধা প্রদান করিতেছিল।

সরোজের শ্বশুর নগেনবাবু ইঞ্জিনিয়ার। দেশে তাঁহার একরূপ থাকা হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি সরোজের বিবাহের সময়ও তিনি আসিয়া জুটিতে পারেন নি। উপস্থিত তিনি রায়গড়ের অন্তর্গত সারানগড়ের রাজার নিকট কর্ম্ম করিতেছিলেন। সারাটা জীবন তাঁহার বাঙ্গালার বাহিরেই কাটিতেছে। তাঁহার সংসারটি খুব ছোট। একমাত্র কন্যা মলয়া, স্ত্রী মহামায়া এবং বিধবা শালাজ ছাড়া সংসারে আর কেহ ছিল না। নগেনবাবু ব্রাহ্ম না হইলেও অনেক দিন পশ্চিমে থাকায়, ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি খুব সৌখীন, ঘোড়ার সখটাই তাহার সব চেয়ে বেশী ছিল। তার স্ত্রী মহামায়া বলিতেন, "ঘোড়া পোষা হচ্ছে ওঁর একটা বাতিক।"

প্রথম জামাতা আসিতেছে বলিয়াই তিনি বাড়ীখানি নূতন করিয়া চূণকাম ও রং করাইয়াছেন। জামাতাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য নানা স্থানের ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একমাত্র চিন্তা এখানে তাঁহারা ছাড়া আর একঘরও বাঙ্গালী নেই। রায়গড় হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে হাতীটলায় তাঁহার বাসা। এখানটা একেবারেই প্রকৃতির নগ্ন-রাজ্য। চতুর্দ্দিক পর্ব্বত মালা পরিবেষ্টিত। পথ-ঘাট অসমতল। রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হওয়ায় আশঙ্কার বিশেষ কারণ আছে। ব্যাঘ্রের চীৎকার নিশীথিনীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে। এমন স্থান সরোজের পক্ষে ভাল লাগিবে কি না, একথাটাই নগেনবাবুর অনেক বার মনে হইতেছিল। তাহার পর তিনি স্থির করিয়া-

ছেন, সকালে বৈকালে সরোজের ঘোড়ায় করিয়া বেড়াইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবেন। ঘোড়ায় সোয়ার হওয়াটাকে তিনি বড়ই পছন্দ করিতেন। ভাবিতেন এটা জামাতার পক্ষে খুবই নূতন ব্যাপার হইবে।

সে দিন রাত্রি চারিটার সময় নগেনবাবু ষ্টেশনে গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন। বৈকালে তার পাইয়াছিলেন, তাহারা বম্বে মেলে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছেন। সকাল সাতটার সময় সরোজ গাড়ি হইতে রায়গড় ষ্টেশনে অবতরণ করিল। নানা রূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনা সারা রাত্রি তাহার মনের দরবারে 'ডিক্রী-ডিস্‌মিস' করিয়া ফিরিয়াছে। অচেনা লোকদের সহিত সাক্ষাতের সময় যতই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল, ততই তাহার বক্ষের স্পন্দন কেমন আপনা হইতে দ্রুত হইয়া উঠিতেছিল। একে ত সে, পাহাড়-পর্ব্বত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। এত বড় বড় পাহাড় জঙ্গল সে যে, কোন দিন দেখিবে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। একটা অপূর্ব্ব আনন্দ-উল্লাস, বল্গাবিহীন দুরন্ত অশ্বের মত কেবলই লাফাইতেছিল—স্থির হইয়া কিছু যেন করা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। সরোজও ঠিক সেইরূপ আনন্দ-উল্লাসের পদ্ধতি-হীন আল্‌গা গতির মধ্যে নিজেকে কেবলই হারাইয়া ফেলিতেছিল।

সাচ্চা জরীর কায করা পোষাক পরিহিত সহিস কোচম্যান একখানি জুড়ী গাড়ি লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল।

সরোজ ও সঙ্গের ভদ্র লোকটী বাহিরে আসিতেই সহিস কোচম্যান তাহাদের যথারীতি অভিবাদন করিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া গিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। সরোজ গাড়ি ঘোড়া দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত

হইলেও মুখে কিন্তু কিছু প্রকাশ করিল না। ধীরে ধীরে সে গাড়িতে গিয়া উঠিয়া বসিল। ট্রেণে সে কোন প্রকারে হাত মুখ ধুইয়া লইলেও কেশ-বিন্যাস করিবার সুযোগ পায় নাই; সুতরাং বিশৃঙ্খল কেশদাম প্রভাত বায়ু স্পর্শে উড়িতেছিল।

ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজি সরোজকে মুগ্ধ করিলেও তাহা অপেক্ষা একটী অভিনব দৃশ্য সে কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিল না। সরোজের ঘোড়ার গাড়ি যখন প্রায় অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সহর ছাড়িয়া গ্রাম্যপথে উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় দুইটী অশ্বারোহী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল! দুই জনের মধ্যে একজন সুন্দর বলিষ্ঠকায় বাইশ তেইশ বর্ষের হাস্যোজ্জ্বল যুবক। অপর-জন সুন্দরী রমণী। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর। কালো আয়ত নয়ন-যুগলে বিদ্যুৎ-দীপ্তি! রক্তোৎপল অধরোষ্ঠে কৌতুকহাস্য! যৌবনের উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্য্য রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। উভয় অশ্বারোহীর মস্তকে সুন্দর রংগীন শিরস্ত্রাণ। তাহাদের মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকাশ্য পথের উপর দিয়া মহানন্দে তাহারা অশ্ব পরিচালন করিতেছে। সারা বিশ্ব যেন তুচ্ছ করিয়া তাহারা সগর্ব্বে চলিয়াছে। সরোজের মনে হইল ইহারা নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী হইবে। তাহাদের আচরণ দেখিয়া, এই অভিনব দৃশ্যে অনভ্যস্থ সরোজ বেশ একটু আনন্দ পাইল। সে অনিমেষ নয়নে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতেই, ছি, ছি, সুন্দরী যুবতী বঙ্কিমনয়নে সরোজের দিকে একবার চাহিয়া পার্শ্বস্থিত যুবককে ধীরে ধীরে কি বলিল। তারপর তাহারা উভয়ে সরোজের অসংযত ব্যাকুল দৃষ্টিকে পরিহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া

গেল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "তুমি কি জীবনে কোন দিন সুন্দরী রমণী দেখ নাই?"

সরোজ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং লজ্জায় তাহার মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি তাহার দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইয়াছেন কি না। যদি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় ত শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কথায় কথায় বলিয়া ফেলিতে পারেন। এত দিন পরে অচেনাদের মধ্যে প্রথম পরিচয়ের পথে এ কি বিড়ম্বনা! কিন্তু সরোজ যখন দেখিল, ভদ্রলোক সারা রাত্রি অনিদ্রা হেতু প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু স্পর্শে পরম সুখে ঢুলিতেছে তখন সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে আর কোন দিকে তাকাইল না।

৩

গৃহের দ্বারেই নগেনবাবু তাঁর স্ত্রী মহামায়া এবং চাকর-বাকর সকলেই আগ্রহান্বিত অন্তরে ব্যগ্র নয়নে জামাতার নবাগমনকে অভিনন্দিত করিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দূরে গাড়ী দেখিবা মাত্র আনন্দে মহামায়া বলিলেন, "ওই যে সরোজ এসেছে।"

দেখিতে দেখিতে, গাড়ি আসিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইল। সরোজ গাড়ি হইতে নামিয়া শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীকে যথারীতি প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা সরোজের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। মাথায় হাত দিয়া নবাগত অতিথিকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। "রেলে আসতে কোন প্রকার কষ্ট হয়েছে কি না? বেন-ঠাকুরুণ কেমন

আছেন?" ইত্যাদি কুশল সংবাদ লইতে লইতে সকলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

৪

চা-টা খাইয়া সরোজ তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়া তার মামী-শাশুড়ীর সহিত নানারূপ গল্প করিতেছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বোধ হয় কল্‌কাতার বাইরে আর কখনো আসো নি?"

"আস্‌বার কোন প্রয়োজনও হয় নি?"

"পথে আস্‌তে বড় বড় টনেল গুলো দেখেছ? রাত্রে বড় ভাল বোঝা যায় না।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "বড় মজা হয়ে গিয়েছে মামি-মা। টনেলের কথা আমার অনেক বন্ধুকে গল্প কর্‌তে শুনেছি। সেজন্যে সারা রাস্তা জেগে এসেছি দেখ্‌ব বলে, কিন্তু ঠিক ঐ সময়টাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন টনেল ছেড়ে এসেছি।"

"আর এক দিন এখান থেকে দিনের গাড়িতে গিয়ে দেখে এলে হবে'খন।"

"আচ্ছা এখানে বাঙ্গালী খুব কম বুঝি? আসবার সময় পথে ত একটী বাঙ্গালী দেখ্‌তে পেলাম না!"

"বাঙ্গালী বল্‌তে আমরাই যা আছি—এমন দেশে সখ করে কে আস্‌বে বল?"

"আচ্ছা মামী-মা, তা'হলে আপনাদের এখানে থাকতে বড় কষ্ট হয় বলুন ?"

"বাঙ্গালী না থাকলেও এ দেশের লোক ত আছে—তাদের সঙ্গে থেকে থেকে তাদের আর কোন দিক দিয়ে পর মনে হয় না।"

এই সময় তাহাদের ঘরের সম্মুখ দিয়া দুইটি যুবতী সরম-শঙ্কিত চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। সরোজ তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাইল। উভয়েই সুন্দরী। কিন্তু তাহারা এ বাড়ীর কে ? এ কথা মুখে আসিলেও প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইল। সে খোলা জানালা পথে দেখিল, প্রভাতে কাল পাহাড়টি কেমন এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ধূপছায়ার মত উহা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। সরোজের মনে হইল এ বাড়ীতে তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ছাড়া অপর স্ত্রীলোক কেহ আছেন ? হয় ত কোন আত্মীয়া হইবেন, কারণ সে পূর্ব্বে শুনিয়াছে তাহারা ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী এখানে নাই। সে বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেল। তার স্ত্রী মলয়া তাহার নিকট যে সম্পূর্ণ অপরিচিতা—সে একা আছে ভাবিয়া সরোজ মনে মনে বেশ একটা উৎসাহ ও শান্তি পাইয়াছিল যে, অচেনা মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব বা কষ্ট হইবে না কিন্তু আর একটি যুবতীকে দেখিয়া সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কাহাকে কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে, শেষে কি একটা—সরোজ ঘামিয়া উঠিল। মনে মনে তার জননীর উপর ভারী অভিমান ও রাগ হইল। অবশেষে সে মনে করিল, আচ্ছা মলয়ার আক্কেল কি ? এখানে ত আর কেহ পুরুষ মানুষ নাই। তার চিনিবার পক্ষে কোন অসুবিধার কারণ থাকিতে পারে না। তার কি উচিত নয়, আমাকে এ সঙ্কটে সাহায্য করা ? এতক্ষণ আসিয়াছি

তার কি একবারও আসা উচিত ছিল না? এত দিন পরে এই প্রথম আসিলাম—আমার পক্ষে এবাড়ীর সব নূতন, অচেনা, কিন্তু তার ত সবই পরিচিত। তবে সে কেন আসিল না? সে ত আর কনেবৌ-নয়! সরোজকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তার মামী শ্বাশুড়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সারা রাত্রি গাড়িতে ঘুম হয় নি একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর! এর পর গল্প করা যাবে'খন।" বলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সরোজ মনে মনে বলিল, "আমি বুঝি ঘুমুতে এসেছি।"

সম্মুখে একটা কাচের আলমারীতে অনেক বই সাজান ছিল—এক খানি বই টানিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পড়িতে মোটেই ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। দেখিল গ্রাম্য পথে কোথাও একটাও লোক নাই, কতগুলি গরু লেজ নাড়িতে নাড়িতে অদূরস্থিত মাঠের উপর পরম উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। একটা মহুয়া বৃক্ষের ছায়ায় একজন বোধ হয় দূরযাত্রী পথিক কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম সুখে অভিভূত। গাছের পাতার স্নিগ্ধ-ছায়া-শীতল অন্তরালে স্তব্ধকুজন পক্ষীকূল বিশ্রাম করিতেছে। আকাশে মেঘের ও আলো ছায়ার শিকার চলিতেছিল।

এই সময় সরোজের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া পশ্চাৎ হইতে তরুণী ডাকিল, "আচ্ছা মানুষ আপনি। সারা রাত্র জেগে এসে চোখে ঘুমের নাম নেই! সহরে অত শত নূতন নূতন কত কি দেখে এসে—এই জনহীন পর্ব্বত-ঘেরা মরু-দেশ দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌ছে?"

সরোজ পশ্চাৎ ফিরিয়া অপরিচিত সুন্দরী যুবতীকে এমন ভাবে কথা বলিতে শুনিয়া ও মৃদু মৃদু হাসিতে দেখিয়া কেমন হইয়া পড়িল। শত

সঙ্কুচিত ব্যাকুল প্রশ্ন তাহার কণ্ঠে আসিয়া কুণ্ঠায় স্তব্ধ হইয়া গেল। সরোজের এই অসহায় অবস্থাটি তরুণী বুঝিল। তাহার নয়ন কোণে একটা তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল। সে ক্ষিপ্রহস্তে সরোজের হাতখানি নিজ হস্তের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিতার মতই টানিয়া লইয়া বলিল, "পুরুষমানুষ ভয় পেলেন না কি? না আমাদের দেশের অসভ্যতা মনে করে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন?" বলিয়া সে অঞ্চল দুলাইয়া হাসিয়া উঠিল।

সরোজের মনে পড়িল চারি চক্ষু মিলনের কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে তার সাহসে কুলাইল না। ঢোক গিলিয়া সে কোনো মতে বলিল, "না—না—আপনাকে—"

"বুঝেছি। কখ্‌নো দেখেন নি—এই না? আমি কি আপনাকে কোন দিন দেখেছি—মনে করেন না কি? না, যে পাহাড় গুলো এতক্ষণ ধরে বিস্ময়ে বিমুগ্ধের মত অনিমেষ নয়নে দেখিতেছিলেন, সে গুলোই বা পূর্ব্বে কোন দিন দেখেছেন? প্রথম দেখাটা সকল সময় সর্ব্বত্রই প্রথম দেখা।" বলিয়া সুন্দরী সরোজকে একবারে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া সম্মুখের আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিল। তার পর প্রসন্নমুখে হাসিয়া মাধুর্য্যে গৃহটি উদ্ভাসিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশটা কি সত্যিই আপনার ভাল লেগেছে?"

সরোজ এবার একটু সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "এমন সুন্দর মুক্ত প্রান্তর, এমন সুনীল আকাশ বড় একটা দেখেছি বলে স্মরণ হয় না।"

তরুণী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "বলুন, বলুন আর এমন আকাশ, এমন একান্ত নির্জ্জনতা, আর নারীর এমন গায়ে পড়ে আলাপ করার অস্বাভাবিকতা—"

সরোজ এবার অত্যন্ত জোর করিয়া তার সরম-শঙ্কিত নয়নদ্বয়—সুন্দরীর মুখের উপর কোন মতে সংস্থাপন করিয়া বলিল, "অন্যায় বল্‌বেন না, আমি ত............

"না সেজন্য কিছু বলছি না ; শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।"

সরোজ যে নির্লজ্জের মত তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তাহা সে তখন একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তার মনে হইয়াছিল, এ কৌতুক-চঞ্চল অথচ সরল রমণীর চাহনি ঠিক সেই অশ্বপৃষ্ঠের দৃষ্ট মহারাষ্ট্রীয় তরুণীর মত। কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। কে এ রমণী ?

"আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে দেখ্‌ছেন ? এমন বুঝি আর কখন দেখেন নি ? আপনি কিন্তু বড় মজার লোক !"

রহস্যময়ী তরুণীর কথায় সরোজ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কেন ? আপনি যা মনে কর্‌ছেন,—"

সরোজের কথায় বাধা দিয়া কাল আঁখির কোলে মধুর হাসির অলস তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়া তরুণী উত্তর করিল, "মনে মনে আমাকে অভদ্র মনে কর্‌ছেন ? খুব রাগ কর্‌ছেন কেমন ? আচ্ছা আপনার একটা দোষ অবশ্য স্পষ্ট করে দেখিয়ে না দিলে, আপনি সত্যি রাগ কর্‌তে পারেন।"

যুবতীর কথায় সরোজ এবার বাধা দিয়া বলিল, "আমি অমন কোন কথাই মনে করি নি।"

"না করে থাকেন, সেটা হচ্ছে তা হলে আমার অসম্ভব সৌভাগ্য। সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে সেটা কিন্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে করাই শত করা নিরেনব্বই জনের পক্ষে স্বাভাবিক। তার প্রমাণ আমি

নিজেই দিচ্ছি। আপনার সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েই বল্‌ছি—আপনি শিক্ষিত, কলেজের ছাত্র, সহরে সভ্যতার মধ্যে বিচরণ করেন, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে আপনার সম্মুখে পরিচিতার মত আলাপ কর্‌ছি, তথাপি কিন্তু আপনি ভুলেও একবার ভদ্রতার খাতিরে, সুন্দরী না হলেও, বস্‌তে বল্লে বোধ হয় অশোভন হতো না।" বলিয়া সরল ভাবেই সে হাসিয়া উঠিল এবং সম্মুখের চেয়ার খানি টানিয়া লইয়া আরাম কেদারার পার্শ্বে এমন ভাবে উপবেশন করিল যে, অনেক সময় বাতাসে তাহার অঞ্চল প্রান্ত উড়িয়া সরোজের মুখের উপর পড়িতে লাগিল।

সরোজ এই ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার মত কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাইল না। অত্যন্ত বিনীত ভাবেই সে বলিল, "সত্যিই এটা আমার বড় অপরাধ হয়েছে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন।"

সুন্দরী হাসিয়া সরোজের হাতে পাণ দিয়া বলিল, "পাণ খান"। তাহার পর পুনরায় বলিল, "অপরাধ কি একটা যে ক্ষমা করলেই হলো?"

সরোজের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে ভাবিয়া পাইল না, এরই মধ্যে সে কত গুলি অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। ভাবিল হইয়াছে, প্রথমতঃ অমন ভাবে তার প্রতি চাহিয়া থাকা যে একটা গুরুতর অপরাধ সে বিষয় সন্দেহ নাই! আরও হয়ত কত কি করিয়াছে সে ধরিতে পারে নাই। বসিতে না বলা সত্যই বড় অন্যায় হইয়াছে। অচেনারা যে তাহাকে এতখানি চেনা করিয়া মুস্কিলে ফেলিবে, বা ফেলিতে পারে, সে কথাটা কোন দিন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তাহার পর তাহার মনে হইল এ সুন্দরী তরুণী কে? যিনিই হউন—খুব সরল, খুব সুন্দর! মনের মধ্যে যেন কোন কথা গোপন রাখিতে

শেখেন নাই। এবার সরোজ বলিল, "দেখুন আগাগোড়া যতগুলি অপরাধ হয়েছে সবই আপনাকে মাপ করতে হবে।"

"আচ্ছা আপনাকে এবারকার মত মাপ করাই গেল। অপরাধ স্বীকার যখন করলেন, তখন আর উপায় কি? নইলে জরিমানা করবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। পাণ গুলো হাতে করেই যে রেখেছেন? ওগুলো হাতে করে রাখ্‌বার জিনিষ নয় সেটা অবশ্য বলে দেবার প্রয়োজন হবে না।" বলিয়া তরুণী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সরোজ সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আপনি খুব সুন্দর লোক।"

"বটে! যা'হোক কথাটা লিখে দিন। প্রশংসা-পত্রটা সময় বিশেষ কাযে লাগ্‌তে পারে।"

সরোজ বলিল, "আপনি ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, আপনার মত মানুষ খুব কম দেখেছি।"

"সেই জন্যেই ত বল্‌ছি, কথাটা লিখে দিন। পুরুষ মানুষ প্রথম পরিচয়ের সময় বিসেষতঃ পরের স্ত্রীকে অমন অনেক কথা অবাধে বলে, তা জানি। তারপর সব ছায়াবাজির মত উড়ে যায়।"

এই সময় পূর্ব্বদৃষ্ট অপর যুবতী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বেশ গল্প জমিয়ে তুলেছিস্‌ ত দেখ্‌ছি। বেলা যে দুটা বাজে। খেতে দেতে দিবি? না, গল্প খাইয়ে রাখ্‌বি?"

"আচ্ছা এখন আসি। বাড়ীর লোকেরা রাগ করছে। এরপর তখন গল্প হবে'খন।" বলিয়া যুবতী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সরোজ ভাবিল ইনিই বা কে? আর যিনি দুয়ারে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়া গৃহে না আসিয়া চলিয়া গেলেন তিনিই বা কে? সে তখন

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিন বৎসর পিছাইয়া গিয়া স্মরণ-শক্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ছাৎনা-তলার চারি চক্ষুর দৃষ্টিবিনিময়কে মনে করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু এই দুইখানি সুন্দর মুখ তাহার স্মৃতিশক্তির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সরোজ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল।

৫

সে দিন মধ্যাহ্নে তিনজনে তাস খেলিতেছিল। মলয়া সরোজকে তাসে হারাইয়া দিয়া খুব আনন্দ করিতেছিল। মলয়ার সঙ্গিনী চিমনী বলিল, "আপনার দেখছি এখান এসে পর্য্যন্ত আগাগোড়া হারের পালা চলেছে।"

সরোজ উত্তর করিল, "যাত্রাটা বোধ হয় ঠিক করা হয় নি।"

"মাহেন্দ্রক্ষণ দেখেই যে যাত্রা করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, নইলে এমন যুবতী সুন্দরী অনায়াসে বশীভূত হয়?" বলিয়া চিমনী হাসিয়া উঠিল।

মলয়া বলিল, "তোর এক কথা চিমনী। লাভ লোকসান যার কারবার, সেই বোঝে ভাল, তুই তার কি ধার ধারিস বল?"

চিমনী সরোজকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, "জামাই বাবু আপনি বলুন ত, যার কারবার লাভ লোকসান সে যে সম্পূর্ণ বোঝে তা মনে হয় না। অনেক সময় ভুল বুঝে বসে থাকে। যে তার হিসাব রাখে সেই বরং ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারে। আমি যে তোর কারবারের হিসাব রেখে আস্‌ছি।"

সরোজ বলিল, "চিমনী তোমার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমি যতই তোমাকে দেখ্‌ছি ততই—

চিমনী সরোজের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "বাকিটা নাই বা বল্লেন ; আমি মনে মনে পূরণ করে নেবো এখন।"

সরোজ এবার হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "আচ্ছা মানুষ! আমি কি বলেছিলাম, আর আপনি কি মনে করলেন।"

চিমনী এবার লঘু হাস্যে গৃহটি মুখরিত করিয়া বলিল, "আমরা স্ত্রীলোক, সর্ব্বদাই চম্‌কে ওঠা, একটা আমাদের স্বভাব বল্লে অত্যুক্তি হয় না। সে জন্যে মনে হয় রোগকে আস্‌তে দেওয়ার পূর্ব্বেই সাবধান হওয়াই শ্রেয়ঃ।"

সরোজ উত্তর করিল, "কথায় আপনাকে পেরে ওঠা দায়। আপনাকে কিন্তু আমার মহারাষ্ট্রীয় বলে মোটেই মনে হয় না।"

"তবে কি আপনার স্ত্রী মলয়াকে মনে হয়?"

চিমনী এখানকার একজন মহারাষ্ট্রীয় জজের মেয়ে। মলয়াদের বাড়ী প্রায় সারা দিন আনন্দ উল্লাসের মধ্যে গল্প করিয়া কাটায়। মেয়েটি খুবই ভাল। গত বৎসর সে বি এ পাস করিয়াছে। আজও বিবাহ হয় নাই।

নগেনবাবুও নিজ কন্যা মলয়াকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু পিতার আদেশে সে কোন দিন তার স্বামীকে পত্র দিতে পারে নাই। তিনি কন্যাকে প্রাণ অপেক্ষা মনে করিলেও, তার শাসন কোন দিন শিথিল ছিল না।

৬

সরোজ তাহার শ্বশুরের নির্দ্দেশ মত প্রতি দিন প্রভাতে ও অপরাহ্নে ঘোড়ায় চড়িয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সহিসের সাহায্যে বেড়াইয়া আসে। প্রথম

প্রথম তার ঘোড়ায় চড়িতে অত্যন্ত ভয় হইত। অনেক সময় লাগাম সমেত পড়িয়া যাইবার ভয়ে দুই বাহু দিয়া ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিত। এ অভ্যাসটা সহিসের আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া যাইতেও প্রায় একমাসের অধিক সময় লাগিয়াছে। সরোজ প্রতিদিন ঘোড়ায় চাপিতেছে কিন্তু এখনও নিজে ঘোড়ায় উঠিতে পারে না, সহিসের সাহায্যে তাহাকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিতে হয়; এখন ঘোড়ার মুখ ধরিয়া তাহাকে আর লইয়া যাইতে হয় না। সরোজ অশ্বারোহণে বেশ আনন্দ পাইয়াছে। আজকাল নগেনবাবুকে, আর সরোজকে অনুরোধ করিতে হয় না। সে নিজেই ঘোড়া লইয়া বেড়াইতে যায়।

সে দিন সকালে সরোজ ঘোড়ার পৃষ্ঠে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সহসা তার শয়নগৃহের বাতয়েনের উপর দৃষ্টি পড়িল। পূর্ব্বদিক হইতে প্রভাত রশ্মি বাতায়নপথের লৌহ গরাদাগুলিকে স্বর্ণরঞ্জিত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সরোজ দেখিল, যেন দুইজন লোক তাহার অশ্বচালনা দেখিয়া হাসিতেছে। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তার স্ত্রী মলয়া আর তাহার পার্শ্বে একজন কে? তাহাকে পুরুষ মানুষ বলিয়া বোধ হয়। সে ভাল করিয়া দেখিল এবং তাহাকে পুরুষ মানুষই বলিয়া স্থির করিল। সেই প্রথম যে দিন সে আসে, পথে অশ্বপৃষ্ঠে উহাকেই ত দেখিয়াছিল। ঘৃণায়, লজ্জায় সরোজের সমস্ত শরীর যেন জ্বলিয়া উঠিল। ও লোকটা ওখানে কি করিতেছে? তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া মলয়ার কানে কানে কি বলিয়া হাসিয়া তাহারই অঙ্গের উপর লুটাইয়া পড়িল। সরোজের মনে হইল এখনি ছুটিয়া গিয়া এক ঘুসিতে ওর মাথাটা চূর্ণ করিয়া দেয়।

সরোজ বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিল, হলঘরের চেয়ারে বসিয়া চিমনী একমনে কি একখানা মাসিকপত্র পড়িতেছে। শাশুড়ীঠাকুরাণী বসিয়া তাহা শুনিতেছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র মহামায়া বলিলেন, "অনেকদূর গিয়েছিলে বুঝি? খুব রোদ্দুর লেগেছে দেখ্ছি। মুখখানি একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে যে বাবা! যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে এসো।"

চিমনী সরোজের মুখের উপর তীব্র হাসিয়া কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "নূতন কিছু শিখ্লেই মানুষের হিসাব বোধটা একেবারে হারিয়ে যায়, তার শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছনাই হয় তার তখনকার একমাত্র লক্ষ্য।"

সরোজ কিন্তু বড় সে কথায় কান দিল না। সে তাড়াতাড়ি তার নিজ গৃহে গিয়া প্রবেশ কবিল। সে খানে যাহা দেখিল, তাহাতে সমস্ত ক্রোধ, সন্দেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরীভূত হইয়া গেল। মলয়া তখন, স্বামীর স্নানের জন্য তৈল, সাবান, গামছা প্রভৃতি এক খানি চৌকীর উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল। সরোজকে দেখিবামাত্র পাখা লইয়া আসিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। নিজ অঞ্চল দিয়া তাহার ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিল। সরোজের মুখ দিয়া কোন প্রশ্নই বাহির হইল না। সে মনে মনে তার নিজ চক্ষুকে পরিহাস করিল। তার পর ভাবিল, সে দিনকার সেই লোকটির চেহারা যেন চোরের মত তার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কল্পনার সাহায্যে তার চক্ষুর সম্মুখে কি বিশ্রী দৃশ্যই না ধরিয়াছিল। এমনি করিয়া মানুষ না জানি, সংসারে কত ভুল করিয়া বসে।

ইহার পর আরও এক দিন সরোজ যখন ঘোড়ায় খুব ভাল করিয়া

চড়িতে শিখিয়াছে, তখন ফিরিবার মুখে দেখিল, জানালায় পূর্ব্বের সেই দৃশ্য ! সে উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া মুহূর্ত্তের ভিতর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মনে করিল আজই এ রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে যাহা দেখিল তাহাতে সরোজের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিরুত্তর হইয়া আরাম চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

মলয়া তখন সরোজের স্থটকেশটি নিবিষ্ট মনে বসিয়া গুছাইতেছিল। সরোজকে অমনভাবে আসিতে দেখিয়া মলয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ? ঘোড়া বুঝি খুব জোরে ছুটিয়ে এনেছ ? বুঝি অনেক দূর গিয়েছিলে, বাঘে তাড়া করেছে না কি ?" তারপর স্বামীর জামার বোতামগুলি সযত্নে খুলিয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সরোজ ভাবিয়া কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না এবং স্ত্রীকে ঘুণাক্ষরে এ কথা বলিতে সাহস পাইল না। এই সময় চিমনী সেখানে আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কেন এসেছি বলুন দেখি ?"

"তোমার সঙ্গিনীকে দেখ্‌তে।"

"এটা ইতিহাস নয় যে পুনরাভিনয় হবে।"

"তবে কি ?"

"আজ সন্ধ্যায় আমাদের—কি বলুন কুটিরে না বাড়ীতে আপনাদের চায়ের ইন্‌ভিটেসন দিতে এসেছি। যেতে ভুল হবে না বোধ হয় ?"

ইতিমধ্যে মলয়া একগ্লাস সরবৎ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া স্বামীকে দিল।

চিমনী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তা হ'লে দরখাস্ত মঞ্জুর কেমন ?"

সরোজ হাসিয়া উত্তর দিল, "একশোবার।"

৭

মধুর আনন্দ, আগ্রহ উৎসাহের মধ্যে সরোজের দিনগুলি বেশ নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতেছিল। অচেনামানুষটির সহিত এখন তার এমন প্রগাঢ় চেনা হইয়া গিয়াছে যে ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। সে দিন, সকালে চায়ের টেবিলে মজলিস খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। শ্বশুর শ্বাশুড়ী, চিমনী, মলয়া, মামীশ্বাশুড়ী সরোজ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া প্রাতরাশ সারিতেছিল। মলয়া পরিবেষণ করিতেছিল। খেইশূন্য এলোমেলো অনেক গল্পই হইতেছিল। নানা দেশের ইতিহাস নগেনবাবু বলিতেছিলেন। কথায় কথায় কথা উঠিল, সরোজ এখন ঘোড়ায় চড়িতে বেশ অভ্যস্থ হইয়াছে, ওকে এ অঞ্চলে একটা চাকরী করিয়া দিয়া এদিকেই রাখ্‌তে হবে। মলয়াকে ত আর চিরদিন এ দিকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে না ?"

মলয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "উনি এখনও ঘোড়ায় ভাল করে বস্‌তেই শেখেন নি।"

মহামায়া বলিল, "না এখন সরোজ একলাই যায়।"

"তা হ'লেও এখন সহিসকে ঘোড়ার উপর তুলে দিতে হয়। আপনি উঠ্‌তে পারেন না!"

নগেনবাবু বলিল, "তুই থাম্।"

সরোজ এই কথায় মনে মনে ভারি চটিয়াছিল। সে আর চুপ করিয়া

থাকিতে পারিল না, সে বলিল, "তুমি মেয়ে মানুষ ঘোড়ায় চড়ার কি জান ?"

মলয়া চিমনীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "তা হলেও তোমার চেয়ে অনেক ভাল পারি।"

সরোজ খুব রাগিয়া উঠিয়াছিল। সকলের সম্মুখে সে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। সে দেখিল, ইতিমধ্যে শ্বশুর মহাশয় কখন উঠিয়া গিয়াছেন। এবার সে জোর কবিয়া বলিল, "দেখ, মুখে বলা আর কাযে করায় অনেক প্রভেদ এ কথা জেনো।"

"ও কথাটা জানি বলেই বল্‌তে সাহস করেছি। তুমি যে রকম করে ঘোড়ায় চড়ে আস, দেখ্‌লে না হেসে কেউ থাকতে পাবে না।"

এ কথা শুনিয়া সরোজ মলয়ার মুখের প্রতি সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল তবে কি সে জানালায় দাড়াইয়া তাহাকে আসিতে দেখিয়া সেই পুরুষটার সঙ্গে তাহাকে পরিহাস করে? সরোজ বলিল, "অত তর্কে কাজ নেই। ঘোড়া চড়ে কেন দেখিয়ে দাও না।"

মলয়া বলিল, "সেটা বড় বেশী আশ্চর্য্য হবার মত কথা নয়।"

সরোজ এবার উত্তেজিত কণ্ঠে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "তুমি যদি ঘোড়া চেপে আমাকে হারাতে পার, পাঁচ টাকা বাজি রাখ্‌ছি হেরে যাব।"

মহামায়া বলিলেন, "বাজি রাখার প্রয়োজন কি? তবে বাবা সরোজ, মলয়া হয় ত তোমাকে হারাতে পারে।" বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

বাজি স্থির হইয়া গেল। সরোজের সহিত মলয়ার ঘোড়দৌড় হইবে। সরোজ বলিল, "তা হ'লে কথা রইল কালই সকালে, কেমন?"

মলয়া বলিল, "বেশ কথা। চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। ওটাকে ঠাণ্ডা করে উপস্থিত কোন লাভ নেই।"

সরোজ চা খাইতে খাইতে মনে করিল, মলয়া মিছা মিছি তাহাকে রাগাইবার জন্য এরূপ বলিতেছে। তার সাধ্য কি সে ঘোড়ায় চড়ে। আচ্ছা শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের ও কথাই বা বলিবার উদ্দেশ্য কি? চায়ের বাটি নিঃশেষ করিয়া সে বলিল,"কেমন তা হ'লে কথা রইল কাল সকালে।"

মলয়া বলিল, "কাল নয়, বাবা বাড়ী থাক্‌বেন। পরশু বাবা বাইরে যাবেন সেই দিন।"

সে দিন সন্ধ্যার সময় নগেনবাবু বাহিরে যাইবার সময় বলিয়া "গেলেন আমি ফিরে এলে সে বাজির টাকায় ফিষ্ট হবে।"

৮

আজ অত্যন্ত ভোরের বেলাই, চা টোষ্ট প্রভৃতি টেবিলের উপর সজ্জিত। চা খাইয়া সরোজ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "দেখ মলয়া একটা কথা এখন থেকে বলে রাখি, আমি সাদা ঘোড়াটা চাপ্‌ব।"

মলয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "যেটা তোমার ইচ্ছা। আমি বল্‌ছি বিনা জিনে ঘোড়ায় চাপ্‌বো।"

সরোজ তাড়াতাড়ি তার শ্বাশুড়ীকে সাক্ষী রাখিয়া বলিল, "আপনি শুনে রাখুন।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মলয়ার সব হচ্ছে ছেলে মানুষী।"

তিনি সে দিন সকালে মামী-শ্বাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সরোজ মলয়াকে তাড়া দিয়া আস্তাবলে আসিয়া দাঁড়াইল। সে সহিসের নিকট কৌশলে সংবাদ লইয়াছিল, মলয়া ঘোড়ায় চড়িতে জানে এবং সে সাদা ঘোড়ায় বেশীর ভাগ চড়িয়াছে। এই সন্ধান পাইয়াই সে নিজেই সাদা ঘোড়াটি পছন্দ করিয়া লইয়াছে। অনেক কষ্টে সহিসের মুখ হইতে সরোজ এই সব কথা বাহির করিয়াছিল। সহিস সরোজকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, এ কথা প্রকাশ হইলে তাহার চাকরী যাইবে। এ সংবাদ পাইয়া সরোজের মনে জয়লাভের আশা যে একটু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা বলা যায়। যাহা হউক সে পূর্ব্ব দিনে প্রাণপণ শক্তিতে শাদা ঘোড়া ছুটাইয়া তালিম দিয়া রাখিয়াছে। যে কোন উপায়ে হউক তাহাকে পুরুষের সম্মান বজায় রাখিতে ও জিতিতেই হইবে।

মলয়া একখানি দেশী চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। দুইটি সুসজ্জিত অশ্ব ছুটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মলয়া গিয়া দুইটি অশ্বের পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া আদর করিল। তাহারা আনন্দে মাটিতে পা ঠুকিয়া হ্রেষারব করিয়া উঠিল।

সরোজ বলিল, "আর বিলম্ব কেন?"

মলয়া সহিসকে ইসারা করিয়া লাল ঘোড়ার জিন খুলিয়া লইতে, আদেশ করিল। ও সে জিন খুলিয়া লইল। সরোজের এবার আশঙ্কা হইল যদি জিন না থাকিলে মলয়া পড়িয়া যায়! সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা জিন থাক মলয়া, ওতে আমার আপত্তি নেই।"

মলয়া বুঝিল সরোজ কেন নিষেধ করিতেছে। মনে মনে সে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিল; কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "কথা দিয়ে কথা ফেরাতে আমি জানি না।"

সরোজ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মলয়া বলিল, "ঘোড়ায় ওঠ।"

সরোজ সহিসের মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র মলয়া সহিসকে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ দিয়া নিজে সরোজের হাত ধরিয়া বলিল, "ওঠ আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌ছি।"

সরোজ অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেখিল, মলয়ার মুখের উপর কি একটা দৃঢ়সঙ্কল্প ও আনন্দ-উল্লাস উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "তুমি ওঠো মলয়া।"

মলয়া একবার চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিয়া লইল। তারপর চক্ষুর নিমেষে নিজ পরিধেয় বস্ত্র ক্ষিপ্র হস্তে সংযত করিয়া জিনশূন্য অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিল ও দৃঢ়হস্তে লাগাম ধারণ করিল।

মুগ্ধ সরোজ অনিমেষ নয়নে সে দিকে চাহিয়া ছিল। সে দেখিল, বাঙ্গালীর মেয়ের মত কাপড় পরিধান করিয়া আসিলেও মলয়ার কাপড়ের ভিতরে জানুদেশ পর্য্যন্ত একটা জামা পরা ছিল।

ঘোড়া ছাড়িল। সরোজের অশ্ব প্রথমে বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মলয়ার অশ্ব বায়ুবেগে সরোজের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

সরোজ মনে মনে চটিলেও একটা গৌরব যে অনুভব না করিল, তাহা বলা যায় না।

প্রায় দুই মাইল আসিয়া সরোজ দেখিল, একটী বড় অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় তাহার শ্বাশুড়ী বসিয়া তাহাদের জন্য উদ্‌গ্রীব অন্তরে অপেক্ষা করিতেছেন। সরোজকে দেখিবা মাত্র তিনি তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন।

সরোজ দেখিল ধুলিসমাচ্ছন্ন করিয়া একজন অশ্বারোহী সে দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী তাহার কাছ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—সরোজ দেখিল অশ্বপৃষ্ঠে চিমনী হাসিতে হাসিতে যাইতেছে; তাহাকে দেখিবামাত্র সে হাততালি দিয়া গেল। ইহার অল্প পরেই মলয়ার ঘোড়া দূরে দেখা গেল। মুহূর্ত্তের ভিতর মলয়ার ঘোড়া সরোজের সম্মুখে আসিয়াই পড়িল—সরোজ বিমোহিত নয়নে সে অপরূপ বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি দেখিল। দ্রুত স্পন্দিত বক্ষ, বায়ু তাড়িত বেণী, মুক্ত উচ্ছৃঙ্খল কেশরাশি, রক্তাভ মুখমণ্ডল, দন্তনিষ্পেষিত আরক্তিম অধরোষ্ঠ, স্বেদরঞ্জিত সুঠাম ললাট—কি মোহিনী মূর্ত্তি! সরোজ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় মলয়া দন্তে লাগাম চাপিয়া দুই হস্ত জোড় করিয়া সরোজকে প্রণাম করিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন। ঘোড়া থাম্‌লে পড়ে যাব। ফিরে আসুন। এ জয় আমার নয় আপনার।"

নগেনবাবু আজ তাঁহার সকল বন্ধু বান্ধবকে নূতন জামাতার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বাড়ীতে মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই এ আনন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। এক একটী স্থানে এক এক দল বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। মলয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। নগেনবাবু সরোজকে সঙ্গে করিয়া সকলের নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করিয়া দিতেছেন। গান বাজনা, হাসিতে যখন সারাগৃহ ভরিয়া গিয়াছে, সেই সময় সরোজ একটু বিশ্রামের জন্য গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া চমকিয়া উঠিল। এ কি? সে দিনকার সেই মহাবাগ্মীর যুবক সেই পোষাকে তাহার ইজিচেয়ারে শুইয়া রহিয়াছে, আর মলয়া তাহাকে

খাওয়াইবার জন্য কক্ষ তলে রক্ষিত খাবারের দিকে হাত ধরিয়া টানিতেছে। সরোজকে দেখিয়া সে কিছু মাত্র চঞ্চল হইল না। বরং বলিল, "দেখ না আজ এই উৎসবের দিনে কিছুতে খেতে চাচ্ছে না।" এ দৃশ্য দেখিয়া সরোজের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই লোকটাই দুই দিন জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অশ্বচালনাকে বিদ্রূপ করিয়াছে।

ভদ্রলোক মলয়ার হাত ছাড়াইয়া লইয়া অত্যন্ত আগ্রহ ভরে সরোজের হাতখানি জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি দেখ্‌ছি একেবারে সিটিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব বলে এসেছি। আপনি অতিথির প্রতি বিমুখ হয়ে থাক্‌লে—দেখছি না খেয়ে আমাকে এখন চলে যেতে হবে। আপনার ঠোঁট কাঁপ্‌ছে কেন সরোজবাবু? এই বিশ্বাস নিয়ে পুরুষ মানুষ নারীকে জয় কর্ত্তে চায়, ভালবাসতে চায়?"

সরোজ কোন উত্তর দিল না, সে তখন রাগে ফুলিতেছিল।

যুবক বলিল, "পুরুষ মানুষের থাক্‌বার মধ্যে শুধু রাগটুকু আছে দেখ্‌ছি।"

মলয়া বোধ হয় আর সহ্য করিতে পারিল না। "চিম্‌নী থাক" বলিয়া তাহার মাথার পাগড়ী টানিয়া সে দূরে নিক্ষেপ করিল।

চিমনী বলিল, "ভ্যালা মেয়ে আর একটু তর সইল না। দেখা যেত পুরুষমানুষটা কত দূর কি করে?"

সরোজ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চিম্‌নী তুমি? একটুও চেনা যায় নি ত। যে দিন আমি প্রথম আসি সে দিনও কি তুমি ঘোড়ার পৃষ্ঠে ছিলে?"

"হঁ্যা গো মহাশয় হঁ্যা, সাক্ষী আপনার এই স্ত্রী মলয়া ; মেয়ের তর সইল না আর, বাপ মাকে লুকিয়ে আপনি আস্‌ছেন শুনে, দেখ্‌বার জন্য ভোরে উঠে গিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা কর্‌ছিল বুঝ্‌লেন ? কাজেই আমাকে পুরুষ সাজ্‌তে হয়েছিল।"

সরোজের বুকের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তোলপাড় করিতেছিল। যাকে অচেনা বলিয়া কত কথাই মনে হইয়াছিল, সে কি না নিজে ষ্টেশনে তাহার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিল।

সরোজ তাড়াতাড়ি চিমনীর হাত ধরিয়া বলিতে গেল, "চিমনী তুমি-

চিমনী হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ওগো লাগে লাগে। আমি যে মেয়ে মানুষ ! কি কর সরোজবাবু।"

তার পর নমস্কার করিয়া, সে ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। সরোজ বিস্ময় বিমুগ্ধনয়নে তার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত দুপুরে

"নিশি-দা, নিশি-দা ?"

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হরিশ ভয়-বিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বাহির হইতে ডাকিল,—"নিশি-দা নিশি-দা।"

স্তব্ধ রজনীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সে শব্দ বহু দূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

নিশিবাবু দেওঘরের একজন বড় উকীল। পসার খুব। উপার্জ্জনও করেন যথেষ্ট। এই মাত্র ঘণ্টা দুই হইল ক্লাব হইতে পাশা খেলিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। আহারাদি সমাপন করিয়া গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া সবে মাত্র শয়ন করিয়াছেন। তন্দ্রাবিজড়িত নয়নে তিনি মাঝে মাঝে এক একবার সতর্ক হইয়া স্খলিতপ্রায় নলটি মুখের মধ্যে ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিতেছেন এবং একটা জোর টান দিয়া তাঁহার জাগ্রত অবস্থার স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছিলেন।

স্ত্রী মনোরমার তখনো আহার শেষ হয় নাই। সে আহার করিতে করিতে স্বামীর সহিত গল্প করিতেছিল। কিন্তু নিশিবাবু তন্দ্রাতুর হইয়া পড়ায়, প্রশ্নের উত্তর বড়ই এলোমেলো হইয়া আসিতেছিল। গড়গড়ার নলটি যখন অধরচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া স্ত্রীর কথার এমন একটা অসংলগ্ন উত্তর দিতেছিলেন যে, মনোরমা অনেক সময় হাসিও সংবরণ করিতে পারিতেছিল না।

এবার মনোরমা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আদালতে কি এমনি করে মক্কেলের মকদ্দমা কর না কি ?"

এ বিদ্রূপ নিশিবাবুর কর্ণে ভাল করিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। তখন তার মুখ হইতে নলটি স্খলিত হইয়া বালিশের উপর আশ্রয় লইয়াছে। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, একটা মক্কেল সমস্ত টাকা কচ্ছ দেশে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে চারিটি মাত্র টাকা দিয়া জোড়হাত করিয়া বলিতেছে, "হুজুর এ বারকার মত এই নিয়ে খুসী হোন। বড় গরীব। কোন মতে আর জোগাড় কর্‌তে পার্‌লাম না। আস্‌ছে বারে বেশী করে দেব।"

নিশিবাবু রাগ করিয়া যেমন তার টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার হাত লাগিয়া নলটিতে টান পড়িল এবং গড়গড়াটী উল্‌টাইয়া গেল। কলিকা ভাঙ্গিয়া, জল গড়াইয়া ঘরের মধ্যে একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "নিশি-দা, নিশি-দা।" মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং বাম হস্তে স্বামীর গা ঠেলিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, "ওগো বাইরে কে তোমাকে ডাক্‌ছে।"

নিশিবাবু স্ত্রীর কথার উত্তরে বলিলেন, "নিয়ে যা তোর টাকা, আমি কিছুতেই তোর মকদ্দমা কর্‌তে পার্‌ব না—ফাঁকি দিয়ে ব্যাটা ফিবার কাজ হয় না" বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রোধভরে মনোরমার হাতটি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

মনোরমা হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাসিয়া পুনরায় গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "ওগো শুন্‌ছ ? বাহিরে কে তোমাকে ডাক্‌ছে।

ফাঁকি দিয়ে কাজ না হয় টাকা দেওয়া যাবে, এখন দেখ কে ডাকৃছে।"

স্ত্রীর স্পর্শে ও ডাকে এবার নিশিবাবু নয়ন মেলিয়া মনে মনে যেন কেমন লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে ডাকৃছ ?"

মনোরমা উত্তর করিল, "আমি নই। অনেকক্ষণ ধরে বাহিরে কে তোমাকে ডাকৃছে। ওই শোন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।"

নিশিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। কাণ পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন বাহির হইতে অত্যন্ত ভয়-বিজড়িত কণ্ঠে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে, "নিশি-দা, শীগ্‌গির দরজা খোল। বড় বিপদ !"

নিশিবাবু তাড়াতাড়ি বস্ত্র সংযত করিয়া শয্যা হইতে নামিবার উপক্রম করিবা মাত্র মনোরমা বলিল, "ওখানে পা দিও না আগুন আছে।" সে দিকে চাহিবামাত্র নিজ কীর্ত্তি বুঝিতে আর নিশিবাবুর বিলম্ব হইল না। তিনি সাবধান হইয়া অবতরণ করিলেন। এই রাত দুপুরে কে ডাকিতেছে ? কণ্ঠস্বর হইতে লোক চিনিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি পারিলেন না। শুধু মনে হইল লোকটি খুবই বিপন্ন। একটা আলো হাতে করিয়া, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু হরিশ! নিশিবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে শিগ্‌গীর বাড়ীর ভিতর চল। আমার বড় বিপদ !"

নিশিবাবু দেখিলেন, রাস্তার উপর এক খানি খালি গাড়ি দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। হরিশ পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "চল চল বাড়ীর ভিতর চল—আমার শরীর কেমন কবৃছে।"

নিশিবাবু দেখিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে। একটা আশঙ্কা-জড়িত কেমন অস্পষ্টতা তাহার উচ্চারণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি যেন কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছেন। লণ্ঠনের আলোক আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া নিশিবাবু সাগ্রহে হরিশের হাত খানি নিজ হাতের মধ্যে ধরিবামাত্র যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন!

একি! হরিশ যে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে!

নিশিবাবু অত্যন্ত সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বলিলেন, "হরিশ ব্যাপার কি? এই ত দু ঘণ্টা আগে ক্লাবে তোমার সঙ্গে দেখা, তখন ত কিছু বল্‌লে না। দেখ্‌ছি তুমি অত্যন্ত কাঁপ্‌ছ। বিশেষ ভয় পেয়েছ নিশ্চয়। ব্যাপার কি?"

হরিশ একবার আতঙ্ক-আকুল দৃষ্টিতে শূন্য গাড়ির প্রতি তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "এখানে আর এক মিনিট নয়, বাড়ীর ভিতর চল।" তার পর শূন্য গাড়িখানির প্রতি পুনরায় চাহিবামাত্র তিনি যেন কেমন হইয়া পড়িলেন। বালকের মত নিশিবাবুকে দুই হাতে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া বলিলেন, "ঐ গাড়িখানিই ত আমার এমন দশা করেছে। এখনো দাঁড়িয়ে আছে। চল ভাই ভিতরে যাই, নইলে তোমারও অবস্থা আমার মত হবে।"

নিশিবাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে হরিশের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন। মনে করিতেছিলেন, নিশ্চয় এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক রকম ঘটনা ঘটিয়াছে যে, হরিশের মত অসীম সাহসী ডাক্তারকেও এমন ভাবে বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছে। নিশিবাবুর ভিতরে

যাইতে যতই বিলম্ব হইতেছিল, হরিশ ততই অধীর ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছিল।

নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীতে তোমার কিছু নেই ত? গাড়োয়ানটা গেল কোথা?"

হরিশ রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমার ইন্‌স্‌ট্রুমেণ্ট ব্যাগটা আছে; তা থাক্, ও ব্যাগ আর বাড়ী ঢুকিয়ে কাজ নেই!"

নিশি বলিলেন, "ভ্যালা লোক ত দেখ্‌ছি! অত টাকা দামের ব্যাগটা ছেড়ে দেব, বল কি? তুমি পাগল হ'লে না কি!"

এবার হরিশ অত্যন্ত আতঙ্ক-উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি পাগল হই নি ভাই—তবে ও ব্যাগ আন্‌তে হবে না। আগে তুমি সব কথা শুন্‌বে চল, তা হলে আর ব্যাগ আন্‌তে তুমিও চাইবে না।"

"তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যে এ দিকে গাড়োয়ান মহাপ্রভু পিট্-টান দেবে। তখন কাকে গিয়ে ধর্‌ব বল?" তার পর নিশি গাড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওরে কার গাড়ী রে? এ দিকে আয় ত দেখি। তোর গাড়ির নম্বর কত?"

হরিশ কিন্তু এবার অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে আস্তে আস্তে নিশিবাবুর কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, "ডাক্‌ছ কাকে, গাড়োয়ান কি আছে! এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই, ভিতরে চল, সব কথা বল্‌ছি।"

নিশিবাবু এবার একটু জোর গলায় তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "ছি! হরিশ তুমি এত ভয় পেয়েছ! তুমি না ডাক্তার? তুমি না এক দিন হাঁসপাতালে মড়া কাটার কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করেছ? সেই তুমি কি না আজ ছোট ছেলের মত ভয় পেয়েছ!" বলিয়া নিশি গাড়ির নিকট

যাইবার উপক্রম করিবামাত্র সহসা গাড়ির ভিতর হইতে শূন্যে হরিশের ইন্‌সট্রুমেণ্ট ব্যাগটি নিশির পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল! এ ঘটনায় নিশিবাবুর অন্তরের মধ্যে একটা অসম্ভব রকমের বিস্ময় দেখা দিল! তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তিনি যেন নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন, নিস্পন্দ দৃষ্টিতে কেবল সেই রহস্যপূর্ণ শূন্য গাড়িখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন!

খানিক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিশিবাবু বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ভৃত্যকে তুলিলেন এবং তাহাকে তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। এত রাত্রিতে ভৃত্য ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মনে মনে ভাবিল বাড়ীতে নিশ্চয় কাহারও না কাহারও অসুখ করিয়াছে, তাই ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। সে কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কে এই রাত্রিতে গিয়া ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিল? এই কাজটার হাত হইতে সে যে কেমন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না, তথাপি তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল বাড়ীর কাহারও শক্ত ব্যায়রাম হইয়াছে। যদিও ডাক্তার ডাকিতে যাওয়ার হাত হইতে এ যাত্রা সে পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু এবার এই গভীর রাত্রিতে তাহাকে যে ঔষধ আনিতে যাইতে হইবে, এ চিন্তা তাহার সারা মন বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল। একে সে ছিল রাতকানা, তার উপর ছিল তার সব চেয়ে ভীষণ ভয় ভূতের।

সে মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিল, আজ যদি কোন রূপে তার প্রাণটা রক্ষা পাইয়া যায়, তাহা হইলে কালই সে চাকরীতে ইস্তফা দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে।

তামাক টানিতে টানিতে নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিশ এখন বোধ হয় অনেকটা সুস্থ হয়েছ?"

"কতকটা অবশ্য। কিন্তু দেখ নিশি-দা", বলিয়া হরিশ নিশিবাবুর খুব নিকটে ঘেঁসিয়া গিয়া বসিলেন। তার পর অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সুস্থ হব কি বলছ! সমস্ত ব্যাপারটা শুনলে তুমিও যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে এ কথা বলতে পারি না। তুমি ভাই আগে একটা কাজ কর। ওই ইনস্‌ট্রুমেণ্ট ব্যাগটা এ ঘর থেকে বার করে দাও। ওই ব্যাগটাকে দেখলে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠে।" নিশিবাবু তখনই চাকরকে ডাকিয়া ব্যাগটা লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন। চাকর মনে করিল যাহা ভাবিয়াছে তাহাই ঠিক। অসুখ না করিলে কি আর এত রাত্রিতে ডাক্তাবাবু আসেন? সে তখন ব্যাগটি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি এই বার বল দেখি? তুমি দেখছি খুবই ভয় পেয়েছ! এখনও কাঁপছ।"

এবার হরিশ নিশি-দার গায়ে গা দিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। তার পর অত্যন্ত আস্তে আস্তে ভয়-বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তুমি ত ভাই নিজের চক্ষে দেখলে যে, যন্ত্রের ব্যাগটা গাড়ির ভিতর থেকে তোমার কাছে এলো—কি করে?" এই কথা কয়েকটা এক রূপ চুপিচুপি বলিলেও তাঁহার মনের মধ্যে বিষম আতঙ্ক হইল,—কে বুঝি, ওই তাহার দিকে তীব্র ভাবে নির্ম্মম নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে ভাঁটার মত বড় বড় রক্ত চক্ষু তুলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হরিশের তখনি মনে হইল, কে যেন

সবলে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া তাহার কথা বলার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে।

নিশিবাবু হরিশের কথার উত্তরে খুব জোর গলায় উত্তর দিলেন, "ও সব কিছু নয়। মনের ভ্রম। যখন মানুষের মনে ভয় হয়, তখন অমন সব কত কথাই না মনে আসে। এ সব বিষয় ঠিক সত্যিই বলে মনে হয়, কিছুমাত্র সন্দেহ করবার থাকে না। মনের কল্পনা অমন অনেক অলীক দৃশ্য ও ঘটনার কথা সত্যের নামে বাইরে অকপটে প্রকাশ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যারা অবশ্য এমন সব অদ্ভুত কাহিনীর কথা গল্প করেন, তারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে মিথ্যা বলেন, এ কথা বলছি না। ভয়ের গর্ভে এমন সব মিথ্যা সত্যের মত হয়ে জন্মগ্রহণ করে যে, তখন বক্তা নিজের কাছে তার সত্য-মিথ্যার পার্থক্য-বোধ হারিয়ে বসে। বলতে বলতে নিজের কথায় নিজেই এমন ভয় পায়, যে তার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠে। অনেক সময় আমার মনে হয় দুর্ব্বল মনের জাগ্রত-স্বপ্ন ভিন্ন এ সব আর কিছু নয়।"

হরিশ বন্ধুর কথায় নিরুপায়ের মত কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'হলে তুমি বলতে চাও, আমি যে কথা বলতে চাইছি সব আমার মনের আতঙ্ক মাত্র? ছ-বছর ডাক্তারী পড়বার সময় হাঁসপাতালে যে সব ব্যাপার ঘটেছে তা দেখে ত আমি কোন দিন ভয় পাই নি। শত শত রোগীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে কত দীর্ঘ রজনী কাটিয়েছি, তাতে ত কোন দিন আমার মনের ভাব এমন হয় নি। সাহসের পরিচয় অনেকে দেয়, তার মূল্য যে কত খানি তা আজ এই গাড়িখানি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমার জীবনে, উপহাস করে, হেসে, বিদ্রূপ করে এমন অনেক গল্প

উড়িয়ে দিতে কোন দিন আমি কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করি নি নিশি-দা ; কিন্তু আজ বেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে হাতী দঁকে পড়্‌লে কেন সে উঠ্‌তে পারে না।"

নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল ছিল না ?"

"শরীর ভালই ছিল। গাড়িতে চড়া পর্য্যন্ত মন্দ হবার মত কোন কারণও ঘটে নি। দেখ নিশি-দা, ছেলে বেলা থেকে ভয় বলে কোন জিনিস আমার মনে ঠাঁই পেত না। তখন বোধ হয় থার্ড ইয়ারে পড়ি। এক জন সহপাঠি ও আমি দু'জনে একটা ঘর নিয়ে থাক্‌তাম। আমাদের ঘরের মধ্যে একটা বড় গোছের টেবিল ছিল। সেই টেবিলের উপর তিন চারটা মড়ার মাথা থাক্‌ত, ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটা সম্পূর্ণ মানুষের কঙ্কাল টাঙ্গান থাক্‌ত। অনেক বন্ধু আমাদের ঘরে ঢুকে চম্‌কে উঠ্‌তে দেখেছি। কিন্তু আমার কোন দিন মনের মধ্যে কোন প্রকার ভয় হয় নি।"

নিশিবাবু বলিলেন, "সেই জন্যই ত আজ আমি তোমার অবস্থা দেখে অবাক্ হয়ে গেছি হে। তোমার মত সাহসী লোক যে কি কারণে এমন ধারা একটা বিষম ভয় পেয়েছে, তাই ভাব্‌ছি।"

হরিশ বলিলেন, "শরীরের দুর্ব্বলতা হেতু যে মানুষের মনের মধ্যে নানা প্রকার ভীতি-সঞ্চারক ভাবের উদয় হয়ে থাকে, তা ভাই নিশি-দা, আমি ডাক্তার উত্তমরূপই জানি—অনেক সময় মানুষ মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখে, সেটা যেমন আমরা বুঝি বোধ হয় সাধারণে তা সহজে বুঝ্‌তে পারে না। তোমাকে একটা দিনের

ঘটনা বলি শোন," বলিয়া যেমন হরিশ বলিতে যাইবে, অমনি ঘরের দ্বারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে লাফাইয়া উঠিয়া নিশিবাবুকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। তাঁহার মুখ দিয়া জড়িত ভাবে কেবল উচ্চারিত হইল, "ঐ, ঐ, কে!"

নিশিবাবু দেখিলেন, হরিশ চক্ষু বুজিয়া কাঁপিতেছে। তিনি দ্বারের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী নমিতা সেই দিকে আসিতেছে। নিশি-বাবু, হরিশের গা ঠেলিয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওহে এক বার চোখ চেয়ে দেখ দেখি কাকে দেখে তুমি কাঁপ্‌ছ?"

নিশিবাবুর কথায় হরিশের কেমন যেন প্রত্যয় করিতে ভরসা হইল না।

নমিতা এ সব ব্যাপার কিছুই জানে না। সে ডাক্তারের যন্ত্রের ব্যাগটি দেখিয়া ব্যাপার কি জানিতে বাহিরে আসিয়াছিল। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, হাস্যরসিক হরিশবাবুকে এমন অবস্থায় দেখিবে! নমিতা তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবুর কি অসুখ করেছে? অমন করে তোমাকে ধরে আছেন কেন?"

নিশিবাবু বলিলেন, "তুমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর না কি হয়েছে।"

নমিতা ডাকিল, "ডাক্তার বাবু।"

নমিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হরিশবাবু ভয়ব্যাকুল অন্তরে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে উৎকণ্ঠা-নিপীড়িত অন্তরে কাতর দৃষ্টিতে নমিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হরিশ নিজের দৃষ্টিকে প্রথমটা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিলেন; কিন্তু নমিতা যখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হয়েছে ডাক্তার

বাবু ? আপনি অমন করছেন কেন ?” তখন হরিশ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তাহার জিভ্ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, “মনটা বড়ই খারাপ বৌ-দি, এক গেলাস জল দাও ত—।”

নমিতা জল আনিয়া দিল। এক নিঃশ্বাসে হরিশ এক গেলাস জল পান করিয়া ফেলিল।

নিশিবাবু বলিলেন, “এখন বোধ হয় তোমার ভ্রম দূর হ'য়েছে। কেমন করে আমরা ভয় পাই তা প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে ত ? সময় সময় এ রকম মিথ্যা ভয় পেয়ে মানুষ মারা পর্য্যন্ত গিয়েছে, শুনেছি।”

“নিশি-দা, ভাই, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর। এমন ভুল যে শত সহস্র বার হ'তে পারে তা আমি মানি। বৌ-দি তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওই চেয়ারটায় বস। আজকের ঘটনার মধ্যে আমি যে তেমন ভুল করি নি আমার সমস্ত কথা শুন্‌লে তুমি বিচার করতে পারবে নিশি-দা। মনে মনে ভাব্‌ছ বৌ-দিকে দেখে আমি অত ভয় পেলাম কেন ? তার উত্তর হচ্ছে পূর্ব্বে যে ঘটনা হ'য়ে গেছে তাতেই আমার মন সম্পূর্ণ ভীত হ'য়েছিল এবং সেই ভয়ের কারণটা যে কি সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে যাবার পূর্ব্বে আমার অতীত দিনের এমন একটা ঘটনার উল্লেখ করতে যাচ্ছিলাম, যেটা শুন্‌লে, তুমি বুঝ্‌তে পারবে, আজকার ব্যাপারটা আমার উপর বড় সহজে অধিকার বিস্তার করতে পারে নি !”

ব্যাপারটা যে কি হইয়াছে নমিতা যদিও তাহা ধরিতে পারিতেছিল না, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিয়াছিল, একটা অসম্ভব রকম কিছু ঘটিয়াছে।

হরিশ বলিতে লাগিলেন, “পূর্ব্বেই বলেছি, আমি ও আমার একটী সহপাঠী বন্ধু দু-জনে মেসের একটী স্বতন্ত্র ঘর নিয়ে তখন থাকতাম, দু-জনেই

ছিলাম মেডিকেল কলেজের থার্ডইয়ার ষ্টুডেণ্ট। পড়া শুনার সুবিধা হবে মনে করে এমন ব্যবস্থাটা করা হ'য়েছিল। আমাদের ঘরের আসবাব-পত্র ছিল, মড়ার মাথা, মড়ার হাড়, আর দু-জনার দু-টা ট্রাঙ্ক, আর একটা টেবিল। তারই উপর থাক্‌ত তিনটে মড়ার মাথা। বেশ মনে আছে, গ্রীষ্মকাল, বিপর্য্যয় গরম পড়েছে, ঘরের ভিতর তিষ্ঠান একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই ছাদের উপর মুক্ত নীলাম্বরের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। রাত্রি প্রায় একটা হবে। যখন নিদ্রাদেবীর কৃপা-কণা লাভ করা বহু ভাগ্য সাপেক্ষ বলে মনে হ'ল, তখন আমার বন্ধুটি বলিলেন, 'চলহে হরিশ ছাদে গিয়ে শোয়া যাক্।' আমি আর দ্বিরুক্তি না করে সম্মত হলাম। আমাদের ঘরে সারারাত্রি প্রায় আলো জ্বল্‌ত। শোবার সময় অবশ্য আলো একটু কম জোর করে দেওয়া হতো। সে দিনও তাই করা হ'য়েছিল। আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বল্‌লেও ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিসই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ আমার বন্ধুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো টেবিলের উপরি-স্থিত মড়ার মাথাগুলোর উপর। সে হাত দিয়ে অতি সন্তর্পণে আমার গা ঠেলে টেবিলের দিকে দেখ্‌তে সঙ্কেত কর্‌লে। চেয়ে যা দেখ্‌লাম, তাতে অন্য কেউ হ'লে যে নিশ্চয় মূর্চ্ছা যেতো সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমার বন্ধুটির মুখ দিয়ে ত কথাই বার হচ্ছিল না। সে নীরব নিস্পন্দ ও নিশ্চলভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়েছিল। আমারও প্রথমটা খুবই ভয় হয়েছিল।"

এবার নিশিবাবু রুদ্ধশ্বাসে হরিশের কথাগুলি একরূপ গিলিতে ছিলেন।

হরিশ একটু থামিয়া বলিল, "এক গেলাস্ জল দাও ত বৌ-দি।"

নমিতা এক গ্লাস জল আনিয়া দিল। জল পান শেষ করিবামাত্র নিশি-বাবু আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর কি হলো ?"

"হ্যাঁ, সেই কথাই ত বল্‌ছি। তুমি মনে করেছ আমার সাহস নেই। সে জন্যই এ কথাটা উল্লেখ না করে পারলাম না।"

"তার পর অনেক অসম্ভব অসম্ভব কল্পনা মনের মধ্যে তাল পাকিয়ে তোলপাড় করে উঠ্‌ল। বেশ স্পষ্ট দেখ্‌লাম, টেবিলের উপর যে তিনটা মড়ার মাথা ছিল তার মধ্যে একটা সেই টেবিলেরই উপর চলে বেড়াচ্ছে। সে কি ভয়ানক ভীতিপ্রদ দৃশ্য—হাত-পা-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন—কেবল একটা মড়ার মাথা টেবিলের একধার থেকে আর একধার পর্য্যন্ত যাতায়াত কর্‌ছে,—আর এক একবার অপর মাথাটার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে! আমার বন্ধু সহপাঠী ত কাঠ হয়ে পড়ে আছেন। ঘরের দরজায় খিল দেওয়া। বাসার প্রায় সকলেই তখন ছাদের উপর। বিছানা থেকে নেমে ঘরের খিল খুলে কাউকে ডাকবার মত সাহসেও কুলোল না। জিভ ও গলা শুষ্ক হ'য়ে গেছে।"

নমিতা এক মনে শুনিতেছিল। সে নিশিবাবুর খুব নিকটে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল ; তার পর বলিল, "ধন্যি আপনার সাহস ডাক্তার বাবু, তখন ঘরের মধ্যে চুপ করে যে কি করে ছিলেন, তা ভাব্‌তে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে।"

হরিশ বলিলেন, "নিরুপায় হ'লে অনেক সময় এমন সাহসও আস্‌তে দেখা যায়, যাক্‌ শোন, আমি মৃদুকণ্ঠে বল্‌লাম, 'ওহে নবীন, চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাক্‌লে কি হবে, দেখ্‌ছ কি, আর একটা মাথা আবার চল্‌তে সুরু করেছে!' সে জড়িত স্বরে উত্তর কর্‌লে, 'যা কর্‌তে হয় তুমি কর,

আমি উঠ্‌তে পারব' না।' তখন আমি মনে মনে রাম নাম স্মরণ করে বিছানার উপর উঠে বসলাম। প্রথমটা আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, আমার দেখ্‌বার ভুল নিশ্চয়, সেই একটা মাথাই চল্‌ছে, কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখ্‌লাম যে, তা নয় প্রথম মাথাটা টেবিলের মধ্যপথে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; টেবিলের শেষ দিকে যে অপর মাথাটা ছিল, এবার সেইটে এগিয়ে আস্‌তে আরম্ভ করেছে। মাঝ বরাবর এসে যে মাথাটা স্থির হয়ে ছিল, তার সাম্‌নে সেটা অল্পক্ষণ দাঁড়াল; তার পর তার পাশ দিয়ে পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। কিছুক্ষণ পরে সেটাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। যখন আর কোন মাথাই চল্‌ল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে দেওয়ালের আলোটা উজ্জ্বল করে দিলাম। খুব ভাল করে মড়ার মাথাগুলার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, কি সর্ব্বনাশ তৃতীয় মাথাটা যে এবার চলতে সুরু করলে! একবার মনে হ'লো টেবিলের ওপর যে রুলটা আছে তাই দিয়ে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দি, দেখি কত বড় সয়তান। মনে হলো সত্য, কিন্তু রুলের দ্বারা মারা ত দূরের কথা—রুলের কাছে যেতেই ভরসা হ'লো না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'লো আমি না দু দিন পরে ডাক্তার হ'তে যাচ্ছি। ছি! ছি! আমার এত ভয়! আমার দ্বারা তা হ'লে সংসারের কোন কাজই হবে না, এ কথা মনে কর্‌তেই নিজে নিজে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হলো। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে রুলটা তুলে নিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই দেওয়ালের গায়ে যে সম্পূর্ণ মড়ার হাড়টা ঝুলোন ছিল, সে দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল। বুকটা কেমন কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু এবার কিছুতে ভয় কর্‌বনা স্থির করেছিলাম। একবার মনে হ'লো, সত্য যেন রক্ত-মেদ-মাংস-শূন্য কেবল হাড়ের মানুষটা

চক্ষু-গহ্বর দিয়ে কটমট করে আমার আচরণের প্রতিবাদ করছে। এবার আমি তাড়াতাড়ি সেই কঙ্কালটার গায়ে হাত দিলাম, আমার অসংযত স্পর্শে সে নড়ে উঠল মাত্র। আমার সাহস বেড়ে গেল। তার পর টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি মধ্যিখানের মাথাটা পুনরায় চলতে আরম্ভ করেছে।"

নমিতা অত্যন্ত উদ্বেগ সহকারে বলিয়া উঠিল, "ও বাবা! ডাক্তারবাবু, ধন্য আপনার সাহসকে। আপনি তখন কাউকে ডাকেন নি, বা ঘরের খিল খোলেন নি? আমি হ'লে ত তখনি সেই খানেই মরে পড়ে থাকতাম।"

নিশিবাবু বলিলেন, "না, এ সত্যই তোমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। তার পর কি হলো?"

হরিশ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "এবার যেমন মাথাটা চলতে সুরু করল, আমি একাবারে গিয়ে সজোরে সেটাকে চেপে ধরলাম। মনে ভেবেছিলাম সে আমাকে ফেলে দিয়ে কি একটা ভীষণ কাণ্ড করে বসবে, কিন্তু হ'ল তার বিপরীত। সে মোটেই নড়তে পারল না। তার পর যেমন সেটাকে তুলে দেখতে গেলাম, ও হার, একটা বড় ইঁদুর তার ভেতর থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।"

নিশিবাবু এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে হরিশের কথা শুনিতেছিলেন। নমিতার একরূপ নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন মড়ার মাথার ভিতর হইতে গজানন-বাহন মূষিক প্রবর এত বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিতেছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হরিশও সেই হাসিতে যোগদান করিলেন। তার পর তিনি বলিলেন, "দেখ ভাই নিশি-দা, সেই দিনের সেই

ঘটনার পর হ'তে আমার মন থেকে চির দিনের জন্য ভূতের ভয় চলে গিয়েছিল। ভূতটুত বড় মান্তাম না এর জন্য কত লোকে কত কথাই না বলেছে, কত বিদ্রূপ যে না শুনেছি তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু আজকের এই ঘটনা আমার সারা জীবনের ধারণাকে একেবারে উল্‌টে দিয়েছে।"

এবার নিশিবাবু হরিশকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বলিলেন, "আজকের ব্যাপার তা' হলে দেখ্‌ছি অত্যন্ত গুরুতর বল ?"

হরিশ বলিলেন, "আমি কি সহজে ভয় পাবার ছেলে। ব্যাপারটা শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। আজ ক্লাব থেকে তুমি চলে আস্‌বার পর আমি আরো খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ছিলাম। রাস্তায় সবে বেরিয়েছি, এমন সময় একটী লোক অত্যন্ত কাতর ভাবে বল্‌লে, 'ডাক্তার বাবু আমার মেয়ের বড় অসুখ একবার যেতে হবে।' লোকটী দেখ্‌লাম নবাগত। এর পূর্ব্বে এখানে কোন দিন দেখি নি। আমি বললাম, 'কাল সকালে গেলে চলে না ?' তিনি তখন জোড় হাত করে বল্‌লেন, 'তা হ'লে বোধ হয় আর আমার মেয়েকে দেখ্‌তে পাব না।' আমি আর কোন আপত্তি কর্‌লাম না। এক খানা গাড়ি দেখ্‌তে বল্‌লাম, শুন্‌লাম তারা 'বিশ্রাম-কুটীরে' আছেন। লোকটী বল্‌লেন, 'ঐ বটতলায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটু এগিয়ে যাবেন, না গাড়ী এখানে আন্‌তে বল্‌ব ?'

আমি বললাম, 'থাক ঐ দিকেই ত যেতে হবে।' তার পর অন্যমনস্ক-ভাবে গিয়ে গাড়িতে উঠে বস্‌লাম। লোকটী গাড়ির ছাতে গিয়ে বস্‌ল বলে যেন মনে হ'লো। তার পর গাড়ি যে কোন দিকে যাচ্ছে সে দিকে আর আমার লক্ষ্য ছিল না। কতক্ষণ যে গাড়ি চলেছে ঠিক বলতে পারি না। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম, গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ কে আমায় স্পর্শ করতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কি ভীষণ ঠাণ্ডা তার স্পর্শ—মনে হ'লো কে যেন এক চাই বরফ আমার গায়ে চেপে ধরেছে। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে যেমন বললাম, 'কে হে বাপু ?' সে কথা বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে হে ! পাশে দেখি কেউ নেই ! কিন্তু সেই হিম-শীতল স্পর্শ কোথা হতে এল, ভাবতে শিউরে উঠলাম। মনে হলো গাড়ির ভিতর থেকে কে যেন নেমে গেল। ব্যাপারটা আমাকে চঞ্চল করে তুললে। গাড়ি যে কোথায় এসেছে বা কোন্ দিকে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না। মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ হলো। গাড়ির ভিতর থেকে বললাম, 'গাড়ি থামা।' কিন্তু গাড়োয়ান কোন উত্তর দিল না—গাড়িও থামল না। গাড়ি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। এবার মনে হ'লো কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়েছি। এত রাত্রিতে আসাটা ভাল হয় নি। তখন গাড়ি থেকে মুখ বার করে কোচ-বাক্সের দিকে চেয়ে যেমন কোচমানকে গাড়ি থামবার জন্যে ধমকে বলতে যা'ব দেখি—কোচবাক্স শূন্য, সেখানে কেউ নাই।

নমিতা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি গাড়ি আপনি চলছিল ? লোকটা বোধ হয় বকুনির ভয়ে গাড়ির ছাদের উপর উঠে বসেছিল ?"

"ঠিক বলেছ বৌ-দি, আমারও তখন ঐ ধারণা হয়েছিল। আমি তাই সেই লোকটার সন্ধানে গাড়ির ছাদের দিকে চাইলাম, দেখি কেউ কোথাও নেই ! গাড়ি কিন্তু ঠিক রাস্তা ধরে খুব জোরেই চলেছে। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ! একবার মনে হ'লো—গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু হাত পা ভাঙ্গার আশঙ্কায় ইতঃস্তত করছি এমন সময় সহসা তোমাদের

বাড়ীর ফটকের কাছে এসে গাড়ি আপনি থেমে গেল। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়েই কাউকে গাড়িতে না দেখে নিশি-দা তোমাকে ডাকি। এখন ব্যাপারটা কি তা কিছু বুঝ্‌লে ? তুমি ত স্বচক্ষেও দেখেছ।"

নমিতা বলিয়া উঠিল, "বোঝ্‌বার আর কি আছে, এ ভৌতিক কাণ্ড।"

এতক্ষণ চাকরটা দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। সে ভিতরে আসিয়া বলিল, "বাবু রোজ ঐ গাড়িখানা রাত্রি একটার সময় এখানে এসে দাঁড়ায় তা অনেকে দেখেছে। ওটা হচ্ছে ভূতের গাড়ি।"

নিশিবাবু বলিলেন, "তুই দেখেছিস দাঁড়াতে ?"

"হাঁ বাবু। এখানকার সবাই জানে বাবু। আপনি ঐ আশ্রমের ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন সে সব বল্‌তে পারবে।"

নিশিবাবু বলিলেন, "দেখ দিকি, গাড়িখানা আছে না চলে গেছে ?"

সে বলিল, "আমি পারব না বাবু।"

নিশিবাবু তখন নিজেই লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া দেখিলেন, গাড়িটা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

সে রাত্রিতে আর কোন অনুসন্ধান হইল না।

পরবেশ

(১)

"হ্যাঁ গো, অত বড় মোটা খামে ও কার চিঠি এলো, তোমার সেই রাজা বন্ধুর বুঝি? তোমার গান শোন্‌বার জন্যে যখন তাঁর এত আগ্রহ, তখন নিশ্চয়ই কিছু বেশী টাকা দিয়ে তোমায় নিয়ে যাবেন।"

ললিতচন্দ্র স্ত্রী অবলার আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেলিত জিজ্ঞাসু নয়ন দুটির প্রতি অত্যন্ত নিরুৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "অবলা, আজো কি তুমি আমার বন্ধু-বান্ধবের আচরণ বুঝ্‌তে পার নি? তাঁদের বড় বড় আশ্বাস-বাণী কি এখনো তোমাকে উৎসাহিত করে?"

অবলা বলিল, "সবাই যে মন্দ লোক এ কথা বলা যায় না। হয় ত তাঁরা যা বলেন, সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করেন। আমাদের অদৃষ্ট দোষে কাজে দাঁড়ায় না। তুমি ত কত দিন, তাদের সহানুভূতি-পূর্ণ অন্তরের কত পরিচয় দিয়েছ। আজ অভাবের জ্বালায় মত বদ্‌লালে চল্‌বে কেন?"

"আমি কি সাধে মত বদ্‌লাচ্ছি অবলা! নিদারুণ অভিজ্ঞতা! বসন্ত রোগের আরোগ্যচিহ্নের মত, মনের উপর যে আঁচড় কাটে, তা কোন দিন যুক্তির সাহায্যে মুছে ফেলা সম্ভবপর নয়। যত দিন যাচ্ছে, ততই অভিজ্ঞতা অসহ্য হয়ে উঠেছে। যাক্,—সে সব কথা: এই চিঠি

খানি খুব মজার, পড়ে দেখ।" বলিয়া ললিত পকেট হইতে চিঠিখানা স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অবলা পত্রখানি আগ্রহ সহকারে তুলিয়া লইয়া পড়িল।

"আপনার পত্র পাইয়াছি। আপাততঃ রাজ-কার্য্যে বড়ই বিব্রত। পরে প্রয়োজন হইলে জানাইব।"

অবলা ঘৃণায় পত্র খানি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিল।

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে, এক খানি ক্ষুদ্র দ্বিতল ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে উপরি-উক্ত কথোপকথন হইতেছিল। সেটা আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে। আকাশ বাতাস বর্ষা-ধৌত সোনালী রৌদ্রে কেমন একটা উৎসাহের আনন্দ-হাস্য দেখা যাইতেছিল। রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য-নির্য্যাতন-অপমান নিপীড়িত পরাধীন বঙ্গবাসীর মনের মধ্যে কে কখন্ যে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই ধরিতে পারে নাই। চারি দিকে যখন এমনই একটা আনন্দ-উল্লাস ঘরে বাহিরে সাড়া দিয়া চলিয়াছে, তখন ললিত, তাহার স্ত্রী অবলা ও দুইটি শিশু পুত্রের একরূপ অনাহারে দিন কাটিতেছিল।

(২)

ললিতের দেশ ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রামে। সেখানেই তার লেখা পড়ার আরম্ভ। তার পর জেলা স্কুল হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে কলিকাতা সহরে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে আসে। দেশে এক মাত্র বৃদ্ধ মাতা ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। জেলা স্কুলে যখন অধ্যয়ন করিত তখন সে স্কুল-হোষ্টেলে থাকিত, সেই

সূত্রে অনেক গণ্য মান্য জমিদার-পুত্রের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। কলিকাতার কলেজে সে পরিচয়টা আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

বাল্যকাল হইতেই ললিতের সঙ্গীতের প্রতি একটা সহজ অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। কোন একটা নূতন সুর শুনিলেই সে আপন মনে গুণ-গুণ করিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইত। পল্লীগ্রামে যখন যেখানে কোন কিছু উপলক্ষে যাত্রা বা থিয়েটারের অনুষ্ঠান হইত, কোন্ সূত্রে এ সংবাদ একবার ললিতের কানে আসিলে আর রক্ষা থাকিত না। সর্ব্বাগ্রে ললিত সেখানে গিয়া উপস্থিত হইত। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যাইত, সে যাত্রার আসরের মধ্যে ললিত তাহাদের সহিত তাহাদের দলের একজন হইয়া "দোয়ার্কী" করিতেছে। ললিত তাল-লয়-মানের সহিত করতালি দিয়া মাথা নাড়িয়া সমজদার গায়কের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত। এ সব করিলেও তাহার সর্ব্বদা মনে থাকিত, সে পল্লীগ্রামবাসী দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র। জননীর প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। মুখে কোন দিন কিছু প্রকাশ না করিলেও তার নিভৃত অন্তরের মধ্যে জাগিয়া থাকিত তার জননীকে সুখী করিবার প্রবল বাসনা। সে দিকে তাকাইয়া সে পড়াশুনায় কিছু মাত্র অবহেলা করিত না। প্রতি বৎসর সে প্রথম হইয়া ক্লাসে উঠিত।

কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়িবার কালে তাহার গানের প্রতি অনুরাগ আরও বাড়িয়া গেল। গান শিখিবার বিশেষ সুযোগ সুবিধাও ঘটিল। কিছু দিনের মধ্যে ললিত সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি ও যশ পাইল। এই সময় তাহার জননী, পুত্রের নিকট হইতে সুখ ও শান্তি লাভ করিবার আশায় আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী

এক দিন অকস্মাৎ তাঁহার সকল সাধ আহ্লাদ অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাহাকে নিজ আধিপত্যের মধ্যে টানিয়া লইল।

শ্রাদ্ধাদি শেষ হইবার পর শূন্য বাস্তুভিটা ললিতকে আর বড় আকর্ষণ করিতে পারিল না। সে কলিকাতায়ই রহিয়া গেল।

এই সময় দেশে স্বরাজ-লাভের একান্ত চেষ্টা ও আয়োজন, নানা দিক দিয়া, সকলের মধ্যে প্রবল পরাক্রমে জাগিয়া উঠিল। সে স্রোতে অনেকেই নিজেকে ভাসাইয়া দিল। কারণে অকারণে, বুঝিয়া, না বুঝিয়া স্বরাজ-প্রত্যাশায় অনেকে অনেক প্রকার আশু-সুখ ও শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত অনিশ্চিতের নেশায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল: সুতরাং সে আবর্ত্তে ললিতও নিস্তার পাইল না। সেও আর বি, এ পরীক্ষা দিতে পারিল না, দিবার জন্য আর কোন চেষ্টাও করিল না। বরং স্বরাজ-লাভের সভা সমিতিতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যাইতে লাগিল এবং স্বদেশী গান গাহিয়া শ্রোতাদের নিকট হইতে অজস্র ধন্যবাদ পাইতে আরম্ভ করিল।

কিছু দিনের মধ্যেই ললিতের নাম চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাহার আন্তরিকতার ও ভাবের সহিত সুর-লয় সংযোগে সঙ্গীত শ্রোতৃবর্গের অন্তরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রস-ধারা সৃষ্টি করিয়া তুলিত। অনেকে স্বরাজ-লাভ অপেক্ষা বিজ্ঞাপনে ললিতবাবুর উদ্বোধন সঙ্গীতের কথা দেখিলেই সভাস্থলে জুটিত। বড় বড় গণ্য মান্য লোকের বাড়ী হইতে আনন্দ-মজলিশে ললিতের নিমন্ত্রণ আসিতে সুরু হইল। তাহার গানের বহুল প্রশংসা সংবাদপত্রের অবাধ মুখে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে সভাসমিতিতে তাহার রীতি-

মত আহ্বান্ আসিতে আরম্ভ করিল। যে সভায়, যে মজলিশে ললিত নাই, তাহা যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইত ; সেখানে লোকেরও তেমন ভিড় হইত না। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক, বিলাস-ঐশ্বর্য্য-প্লাবিত কলিকাতার মত মহানগরীর মধ্যে অতি অল্পায়াসে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে এমনই ভাবে নিজের সম্মান ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লইল। অনেক বন্ধু-বান্ধবও তাহার জুটিল। তাহারা গান শুনিয়া তাহাকে বাহ্বা দেয়, তাহাকে সমাদর করিয়া বাড়ীতে লইয়া যায়, কিন্তু সে কি করে, কোথায় থাকে, তার আর্থিক অবস্থা কেমন, এর কোন সংবাদই তাহারা রাখে না।

(৩)

দেখিতে দেখিতে ললিতও এক জন স্বদেশীর পাণ্ডা হইয়া পড়িল। সে কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াইতে লাগিল। দেশের জন্য জেলে যাইবার ভয় যে সে করে না এমনই আভাষ তাহার রচনায় ও বক্তৃতায় যখন প্রায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন সুরসিক প্রজাপতি ঠাকুর মিহি সূতার এমন একটী ফাঁদ পাতিলেন যে, তাহার মধ্যে ললিত কেমন করিয়া যে কখন্ ধরা পড়িয়া গেল, তাহার সঠিক সংবাদ সেই-ই জানে না, অপরে জানিবে কোথা হইতে। কলিকাতার একজন বড় স্বদেশী পাণ্ডার কন্যা, ললিতের কণ্ঠে বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিল! প্রজাপতি ঠাকুর সুরসিক এবং পুরাতন রসজ্ঞ ব্যক্তি হইলেও বড় সন্দিগ্ধ-মন ও চঞ্চল ; কাজেই পাছে তাহার জালেপড়া ব্যক্তিটি ফাঁকি দিয়া কোন্ দিন সরিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় ষষ্ঠীদেবীকে কানে কানে এমন কি মন্ত্রণা প্রদান করিয়া গেলেন, যে এই ৪।৫ বৎসরের ভিতর ললিতের হাতে

পায়ে স্নেহের বেড়ী উত্তমরূপে আটকাইয়া গেল। তখন কেবল গান শুনাইয়া আর বাহবা লইয়া যে সংসার চলে না, এমন নিদারুণ কঠিন সত্য, তার স্বদেশপ্রাণ বড়লোক শ্বশুর মহাশয় অচিরে বুঝাইয়া দিলেন—মাত্র এক দিন অকরুণ দুইটি কথায়। ললিতের শ্বশুর ধীরেন্দ্রবাবু স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিলেও যখন তিনি বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিলেন যে একের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে দশ হয় এবং দশের পৃষ্ঠে শূন্য যোগ করিলে এক লম্ফে একশত হইয়া পড়ে এবং এম্নি করিয়াই ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়, তখন নিখরচায়-প্রাপ্ত জামাতা ললিতকে এক দিন নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে তিনি জানাইয়া দিলেন, "এখন তোমার সংসার ভগবানের কৃপায় যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে,— আশীর্ব্বাদ করি দিন দিন এমনই ভাবেই বাড়িয়া চলুক,—এখন তোমার একটা ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াও পড়িয়াছে। তখন তোমরা দুটি প্রাণী ছিলে, বড় কিছু আসিয়া যাইত না। আজ ভগবানের কৃপায় তোমার নিজেরই একটা বড় সংসার হইয়া দাড়াইয়াছে। দেখিতেই পাইতেছ এখানে আর স্থান সঙ্কুলান হইবার বড় সুবিধা হইতেছে না।"

রাত্রে উত্তেজিত কণ্ঠে অবলা স্বামীকে বলিল, "আমার বাপের বাড়ী, আমাকে দুটো কথা বল্লে তত গায়ে লাগে না। কিন্তু তোমাকে কেউ কিছু বল্লে আমার সহ্য হয় না। বল কি, ভাবতে আমার মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে,—যার সংসারে কোন কিছুর অভাব নেই, যার স্বদেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য ভেবে ভেবে রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, এমন কথা প্রকাশ কর্তে তিনি কি না মোটেই দ্বিধা বোধ কর্লেন না! তিনি কি না, নিজের কন্যা-জামাই, নাতি-নাতিনীকে অনায়াসে মুখ ফুটে বল্তে পার্লেন

বাড়ীতে জায়গা হ'বে না, —কখন্ না যখন জামাইয়ের কোন কাজ কর্ম্ম নেই!"

ললিত বলিল, "তাঁর দোষ কি অবলা? এত দিন আমারই বোঝা উচিত ছিল। তিনি আমার যথেষ্ট করেছেন। এখন সত্যই আমার সংসার বড় হ'তে চলেছে—এজন্য আমিই দায়ী!"

অপমান-লজ্জা-অশ্রু-ভার নিপীড়িতা অবলা উত্তর করিল, "যখন স্বদেশের দোহাই দিয়ে, বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে তোমাকে দিয়ে বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার পর তোমার উদার অন্তরের কথা দিন রাত আমাদের কাছে গল্প করেছেন, যখন মেসে তোমার খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট অনুভব করে এবং মাকে জানিয়ে বাড়ীতে কত সাধ্য সাধনা করে, আহ্বান করে তোমায় ডেকে এনেছিলেন, তার পর যখন নিখরচায় আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিলেন, তখন ত ভবিষ্যতে স্থান অকুলান হতে পারে এমন কথা ভাব্বার কিছুমাত্র অবসর কাকেও দেন নি!"

ললিত তাড়াতাড়ি অবলার হাত দু'খানি অত্যন্ত প্রীতি ভরে নিজ হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ অবলা ও সব কি বল্‌ছ? ও সব কি আমাদের ভাব্‌তে আছে?"

এবার অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। পিতার এই আকস্মিক হৃদয়হীন ব্যবহারে সে যার-পর-নাই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে নিজে যখন তার স্বামীকে চাকরী করিবার জন্য অনুরোধ করিত, তখন তাহার পিতাই 'চাকরী' এই কথাটা শুনিয়াই এক প্রকার অজ্ঞান হইয়া যাইবার ভাণ করিয়া বলিতেন, "যত দিন আমি বেঁচে আছি তত দিন ললিতকে 'স্লেভ মেণ্টালিটি'র ভেতর যেতে দেব না।"

এই কথা স্মরণ করিয়া অবলা এতটা উত্তেজিত হইয়াছিল।

তাই স্বামীর উত্তরে অবলা বলিল, "কি বল্‌তে আছে, আর কি বল্‌তে নেই তা আমি জানি। কিন্তু তা ব'লে এত বড় অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে কেউ যে থাক্‌তে পারে, তা আমি ভাব্‌তে পারি না। বাবা জানেন, তোমার দেশের বাড়ীতে বর্ত্তমানে ফিরে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। তুমি এখন উপায়হীন, তথাপি তিনি না ভেবে চিন্তে অক্লেশে বল্‌তে পার্‌লেন, এ বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হবে না, আগে হ'তো, তখন তোমরা দুটি প্রাণী ছিলে, এ কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতেও ইতস্ততঃ কর্‌লেন না! আমার ছেলে মেয়ে, তাঁরই ত নাতি-নাতিনী, তাদের ভার এত বেশী! তুমি কি বল গো! আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। যাক্ যা হবার হয়েছে, এখন তোমার স্ত্রীর এ অনুরোধটি রাখ্‌তেই হবে। আজ যেমন করে পার এখান থেকে আমাদের নিয়ে যাও।"

ললিত স্ত্রীর অন্তরের বেদনা বুঝিয়া কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে এক খানি ছোট দ্বিতল বাড়ী ভাড়া নিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যে একটী ধনাঢ্য মাড়োয়ারীর অফিসে তার চাকরী হইল। কিন্তু গানের নিমন্ত্রণ ও কমিল না, বরং বাড়িয়া গেল। সুখ্যাতির মোহও সে কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। এই সঙ্গে এক খানি স্বদেশী সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদকের আসনও সে অলঙ্কৃত করিল। তবে সেখান হইতে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থের পরিবর্ত্তে পুলিশের অনর্থই যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হইল।

(৪)

সে দিন সকাল বেলা ললিত মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার

চাকরী নাই। দুই মাসের অধিক বাড়ী ভাড়া জমিয়া গিয়াছে। তাগিদের উপর কড়া তাগিদ পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। হাতে একটী পয়সা নাই যে ছেলেদের কিছু জল খাবার কিনিয়া আনিয়া দেয়। আজ কোথায় তাহার সেই সব এম, এল্, সি বড় লোক বন্ধু, যারা, কত দিন ক্ষুধা না থাকিলেও তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়াছে! আজ সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেই সমস্ত আহার্য্যগুলির উপর বড় মানুষের অহঙ্কারের স্বর্ণ-তবক জড়ান রহিয়াছে। কেমন করিয়া তখন সেগুলো সে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার হাত পুড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় নাই!

অবলা তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "দেখ আমি অনেক ভেবে ভেবে একটা উপায় মনে মনে স্থির করেছি, কিন্তু তুমি কি তা শুনবে?"

"আজ তুমি বল্‌তে অমন কুণ্ঠিত হচ্ছ, কেন অবলা। তোমার কথা শুনব না? তুমি না থাক্‌লে আমার অস্তিত্ব থাক্‌ত না যে, তা কি তুমি জান না। সকল দৈন্য, সকল অবসাদের মধ্যে তুমিই যে আমার মূর্ত্তিমতী উৎসাহ। সকল অভাব অভিযোগ অপমানের মধ্যে তোমার ভালবাসার গৌরব-মুকুট পরে, উপেক্ষার দৃষ্টিতে সমস্ত অভাব দূরে ঠেলে ফেলেছি। তা ত তুমি দেখে আস্‌ছ।"

অবলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কুণ্ঠিত হই নি। ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না বলে ইতস্ততঃ কর্‌ছি। একটা কাজ কর্‌লে হয় না? গান গাইবার জন্যে তোমার ত কত জায়গা থেকে ডাক আসে,—তাই বল্‌ছিলাম এবার ডাক্‌তে এলে বলে দিও, টাকা না দিলে আর কোথাও গাইবে না। এই গান গাওয়ার জন্যেই সময় মত

আফিস যেতে পার্‌তে না বলে অমন চাকরীটা রাখ্‌তে পার্‌লে না। বাহবা নিয়ে ত আর পেট চলে না।"

"অবলা তোমার এ পরামর্শ খুবই উত্তম। আমিও মনে মনে এমনি একটা কিছু ব্যবস্থা কর্‌ব ভাব্‌ছিলাম। কিন্তু—"

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া অবলা উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল, "এখনো কি কিন্তু বল্‌বার বা ভাব্‌বার অবসর আছে ? তোমার চাকরী নেই, না খেতে পেয়ে,—" বলিয়া অবলা অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "পেশাদার বল্‌বে ভাব্‌ছ ? তাতে কিছুমাত্র অপমান নেই। এতে বরং তোমার মূল্য বাড়্‌বে, যিনি পয়সায় খাতির যদি না থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না। এই যে তোমার গান শোন্‌বার জন্য কত জুড়ী, কত মটর এসে তোমার দরজায় ধন্না দেয়, তা'তে কি আমাদের দুঃখ ঘোচে, না কোন দিন ঘুচ্‌বে মনে কর ?"

সত্যই এ সব কথার কোন উত্তর ছিল না। ললিত স্ত্রীর পরামর্শই গ্রহণ করিল।

এখন সকলেই জানিয়াছে ললিত টাকা ভিন্ন গান করে না। তাহার ডাক একেবারে কমিয়া গিয়াছে। দুই এক জন টাকা দিয়া প্রথম প্রথম ডাকিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই, তার গান যে কিছুই নহে, এমন কথা তাহার বন্ধু বান্ধবের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। এমন কি এখন তাহার গানের ত্রুটী, সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল।

সে দিন একটী ছাত্রকে পড়াইয়া ললিত গৃহে ফিরিতেছিল। এমন সময় তাহার এক বন্ধু তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া একটী আড্ডায় লইয়া গেল। সেখানে তখন তাহারই গান সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা চলিতেছিল।

ললিত উপস্থিত হইতেই আলোচনা অল্প ক্ষণের জন্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু আবার পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে তাহার গানের নিন্দা করিল। ললিত কিছু না বলিয়া অপমান-হত-অন্তরে সেস্থান ত্যাগ করিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া গভীর রাত্রে গৃহে পৌছাইয়া স্ত্রীকে বলিল, "একটা খুব বড় চাকরী পেয়েছি—আর দুঃখ থাকবে না। তবে ৫০০৲ টাকা জমা দিতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া অবলার আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। সে তাড়াতাড়ি তার শেষ অলঙ্কারগুলি আনিয়া স্বামীর পায়ের নিকট রাখিল। সেগুলির দিকে তাকাইতেই ললিতের নয়ন ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "অবলা, এ গয়না নিতে আমার বুক কেটে যাচ্ছে, কিন্তু না নিয়েও আমাব অন্য উপায় নেই। ছেলেদের মুখের দিকে আর চাইতে পারছি না।"

ললিত পর দিন আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "চাকরী হয়েছে। সাহেব খুব ভদ্র। ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট আশা আছে।"

অনেক দিন পরে স্বামীর হাসিমুখ দেখিয়া অবলার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

(৫)

কিছু দিনের ভিতর ললিত বহু টাকা উপার্জ্জন করিল। এখন তাহার এত কাজ, যে আহার নিদ্রার সময় নাই। অনেক দিন প্রায় বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়। এক বৎসরের ভিতর ললিত বালিগঞ্জে এক খানি সুবৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করিল। তাহাতে লক্ষ

টাকার উপর ব্যয় হইল। সহসা ললিতের এই পরিবর্ত্তন অনেক বন্ধু বান্ধবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অনেক বড় লোক বন্ধু পার্টিতে ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ললিত সময়াভাব জানাইয়া সকল নিমন্ত্রণই ফেরত দিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে ললিত পনর হাজার টাকা দিয়া এক খানি মটর কিনিয়াছিল। কিছু দিন পরে সে কাশীপুরের নিকট গঙ্গার ধারে এক খানি সুন্দর বাগানবাড়ীও কিনিল। অতি অল্প দিনের ভিতর ললিতের এ অসম্ভব উন্নতি দেখিয়া অনেকেই স্থির করিল, ললিত নিশ্চয় 'ডার্‌বী সুইপ' মারিয়াছে। কিন্তু ললিত কাহারও সহিত মিশিত না বলিয়া কোন কথাই কেহ জানিতে পারিল না।

এক দিন অবলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "অনেক দিন তোমার গান শুনি নি—একটা গান গাও না।

ললিত খুব গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "আমি ত বিনি পয়সায় গান করি না।"

অবলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভারি ত গান! তার আর কত দাম হবে—তা দিতে পার্‌ব 'খন।

"আমার গানের মূল্য দিতে পার্‌বে? এত টাকা তোমার আছে?

"আছে বই কি। আমার না থাকে, আমার যিনি সর্ব্বস্ব তাঁর আছে।" বলিয়া আবেগ ভরে দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "মূল্য ত পেলে;—এখন গান শোনাবে কি না বল?"

ললিত বহুদিন পরে হারমোনিয়মের নিকট বসিল এবং প্রাণের আবেগ গান গাহিল,—

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজ
পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক মন্দিরে
কমলাসন পাতি॥
তুমি এস হৃদে এস,
হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ
করুণ হাস্য ভাতি॥
তব কণ্ঠে দিব মালা
দিব চরণে দিব ফুলডালা।

অবলা কত দিন তার স্বামীর মুখে কত গান শুনিয়াছে কিন্তু আজ এ কি সুর! কি গান! কি ভাব! এমন প্রাণস্পর্শী গান সে যেন কোন দিন শোনে নাই। সমস্ত গৃহ, আকাশ বাতাস যেন সঙ্গীত-সুধা ধারায় অভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার অন্তরের মধ্যে আজ এমন একটা আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, যাহা তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রুরূপে বাহিরে আসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে মন্ত্র-মুগ্ধার মত আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। গান শুনিতে শুনিতে সে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "ওগো সত্যই আজ আমাদের জীবনের উৎসব রাতি।

তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন গানের সুরের মধ্যে সুর ও প্রাণ মিলাইয়া আত্মহারা! যেন বিশ্বে আর কিছু নাই, শুধু ললিতের গান আর ললিত।"

(৬)

সে দিন অবলা অঞ্চল দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "বেশ মজার লোক ত ?"

ললিত বলিল, "কেন, মজা কোন্ খানটায় দেখ্‌লে বল ?

"সে দিন যে বল্‌লে তোমার চাকরীর ইতিহাসটা আমাকে বল্‌বে ?"

"হাস্‌বে না বল ?"

"হাস্‌বার কথা হ'লে হাস্‌ব না ? মুখ বুঝে আমি থাক্‌তে পারব না।

"এত দিন ত ছিলে অবলা। আমাকেও থাক্‌তে অনুরোধ করেছিলে।"

অবলার মুখ খানি অতীতের কথা স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তের ভিতর ম্লান হইয়া গেল। সে ধরা গলায় উত্তর করিল; "হাস্‌ব না।"

"রাগ কর্‌লে অবলা ?"

"ওগো না, না, তুমি বল্‌বে কি না বল ?"

"আচ্ছা বল্‌ছি শোন। আমার নূতন চাকরী হচ্ছে তোমার সেই গয়নাগুলি।"

অবলা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তার মানে !"

"তার মানে তোমার গহনা বিক্রয় করে ৮০০৲ টাকা পাই, সেই টাকা থেকে ২০০৲ টাকা দিয়ে সাহেবী হোটেলে একটী ছোট ঘর ভাড়া নি। দুটা সাহেবী পোষাক তৈরি করাই এবং খুব সুন্দর একটী সাহেবী মুখোস ও দু'টো হাত কিনি।"

অবলা বলিল, "ওসব কি বলছ ?"

"উতলা হয়ো না। আগে শোন। তার পর সাহেবদের সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিই যে, এক জন জার্ম্মান পণ্ডিত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিখিয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী এবং সুন্দর গান করেন, যে শুনিলে কেহই মনে করিতে পারিবে না যে, এক জন ভক্ত বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহ প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া এ সব গান গাহিতে পারে। প্রতি দিন একটী ঘণ্টার পারিশ্রমিক ২৫০৲ টাকা।"

"তুমি যে অবাক কর্‌লে! আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছ বুঝি।"

"না অবলা, এর একটী বর্ণও মিথ্যা নয়। উপেক্ষার নিদারুণ অপমান, আভিজাত্যের অসহিষ্ণু অহঙ্কার সহ্য কর্‌তে না পেরে, আমার বেদনা-কাতর অন্তরের ক্ষুব্ধ মানুষটি আমাকে এমনি করে প্রতিশোধ নিতে প্রবুদ্ধ করে তুলেছিল।

"ও কি তোমার চোখে জল কেন?"

"স্বদেশবাসীর নিকট নিজ পরিচয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি বলে, মূল্যহীন বলে, ধূলায় গড়াগড়ি খেয়েছি বলে।"

এবার অবলা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তার পর?"

"সাহেবদের কথা ছেড়ে দাও, তারা ত পয়সা দিয়ে জার্ম্মাণের মুখে বাঙ্গলা গান শুন্‌বেই। কিন্তু আমার দেশের সে-ই সব বড় লোক, যাঁরা এক দিন পয়সা দিয়ে আমার গান শোনা অপব্যয় বলে মনে করেছিলেন, বিদেশীর মুখে বৈষ্ণব পদাবলী শুন্‌বার জন্য তাঁদেরই কি ভীষণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। মুগ্ধ হয়ে বিদেশীর হাতে তাঁরাই মুঠো মুঠো টাকা তুলে দিয়েছেন। বুঝ্‌লে অবলা, তার ফলেই এই সব। এর মধ্যে আরও একটু মজার কথা আছে অবলা, আমার যে সব বন্ধু-বান্ধবেরা, প্রথমে বিনি

পয়সার গান শুনে খুব তারিফ করতেন, তার পর টাকা দিয়ে গান শোনবার কথা বলতেই যারা আমার গানের নিন্দে করে বেড়াতে লেগেছিলেন, তারাই এখন জার্মানের মুখে বৈষ্ণব পদাবলী শোনবার জন্যে এর তার খোসামুদী করে একখানা টিকিট যোগাড় করে কোন রকমে সেই সব বড় লোকদের আসরের এক কোণে গিয়ে বসতে পেরেছেন ! আর—আর যে সমস্ত সংবাদ পত্র আমার গানের ক্রমাগত নিন্দে করেছে, সেই বিদেশীর অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের প্রশংসায়, সেই সমস্ত দেশী সংবাদপত্রগুলি মুখর হ'য়ে উঠেছে !"

"বটে !" বলিয়া অবলা স্তব্ধ হইয়া রহিল।

"অবলা তুমি অমন নির্ব্বাক হয়ে গেলে কেন ?"

"ভাব্ছি জগতে সত্যের মূল্য কতটুকু এবং কোথায় ? মিথ্যার ছাপ নিয়ে কি সত্যের প্রচার হবে !"

শিকারী

(১)

প্রতি বৎসরই আমাদের ছয় মাস করিয়া পশ্চিমে থাকা হয়। সেবার দেশের বাড়ীতে অত্যন্ত অসুখ হওয়ায় আমাদের যাওয়া দুই মাস আগেই হ'য়েছিল। সেটা হবে আশ্বিনের শেষাশেষি। বেড়াতে যাওয়া হ'বে ব'লে তাড়াতাড়ি অনেক অনুরোধ করে আমাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ীর সকলে, একটু বলাবলি কর্‌তেই মত দিয়েছিলেন; কিন্তু যিনি আমার সর্ব্বস্বের মালিক তিনি ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন। বাবা তাঁহাকেও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তেমন মানুষ নন; অনেক সাধ্যসাধনা, ও তর্ক বিতর্কের পরও রাজি হ'লেন না। তিনি স্বামী, তাঁর অনেক গুণ, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁর একটা বড় দোষ ছিল, বেশীরকম একগুঁয়ে—একবার না বল্লে, হাঁ বলান খুবই কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক অনেক অনুনয় বিনয়ের পর আমার ছাড়পত্র মঞ্জুর হ'য়ে গেল। আমিও হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। বাপের বাড়ী চ'লে এলাম।

একটা কথা এখানে না বল্লে হয়ত বল্‌বার আর সুযোগ পাব না। আমি বাবার বড় মেয়ে। আমার আর একটি ছোট বোন আছে, তার নাম নীহারবালা, আর আমার নাম মেঘমালা। আমার একটী মাত্র ভাই, সে সবার চেয়ে ছোট। তার নাম বিজলীকুমার। বাবা ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট

অর্থোপার্জ্জন করেছেন। ব্যবসা আছে এবং ভালোই চল্‌ছে। আজ এক বৎসর হ'লো নীহারের বিবাহ হ'য়ে গেছে। সে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'য়েছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বাবার আন্তরিকতা খুবই। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে তিনি আমাদের লেখা পড়া শিখিয়েছেন। লেখা পড়া শিখিয়েছেন বলে, মনে কর্‌বেন না যেন কেবল বইই পড়াইয়াছেন। শেলাইয়ের কাজ, রান্না বান্না, সময় মত বাড়ীর প্রাঙ্গণে শাকসবজী রোপণ, ডাক্তারির মোটা মোটা বিষয়গুলি, সকল রকম কাজ আমাদের শিখিয়েছিলেন। আবার রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পড়ে, অবসর সময় বাবাকে, মাকে, শোনাতে হ'তো। এখনও শ্বশুরবাড়ী থেকে এলেই, পূর্ব্বের কাজগুলি যথারীতি কর্‌তে হয়। জীবনে বোধ হয় নারীর অদৃষ্টে এত বড় সৌভাগ্য খুব অল্পই দেখা যায়। আমার শ্বশুরেরাও খুব নামজাদা বড় লোক। বাবা বহু অর্থব্যয় করে তাঁর মনোমত জামাতা করেছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, কোন দিক দিয়া তাঁর অপযশ কেউ কোন দিন কর্‌তে পারে নাই; আর ভবিষ্যতে পার্‌বে বলে মনে হয় না। যা একটু একগুঁয়ে তিনি, তা বোধ হয় আমার জন্যই।

আমার স্বামীর নাম শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এম্‌-এ, পাস করিয়া পৈত্রিক জমিদারীর কাজ কর্ম্ম দেখেন। মনে করিয়াছিলাম, একটা কথা আর আপনাদের কাছে প্রকাশ করিব না। কিন্তু সেই কথাটী বলিবার জন্যই ত এত কথার ভূমিকা। আশঙ্কা হয়, পাছে আপনারা বাঙ্গালীর মেয়ের এটাকে একটী বিষম উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঔদ্ধত্য বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। আর এ দিকে ভাব্‌ছি কথাটা লুকিয়া রাখিলে আমার অন্তরের মর্ম্মবেদনা কোন দিনই প্রকাশ করিতে পারিব না। আমার কৃত অন্যায়

নিষ্ঠুর আচরণ, চিরজীবন আমার অন্তস্তলের মধ্যে থাকিয়া আমাকে অহরহঃ পুড়াইতে থাকিবে। আমার সারা জীবনের নয়নাশ্রুধারা তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না। এদেশে নারী নির্য্যাতনের কথা সকলেই জানেন। অসহায়া বঙ্গকুলবধূগণকে দুর্ব্বৃত্তগণ কি পাশবিক অত্যাচারে না জর্জ্জরিত ও লাঞ্ছিত করিয়া থাকে! আদালতের বা আইনের সাহায্যে সে নিদারুণ অপমানের প্রতিকার সম্ভবপর নয়। এমন গল্প বাবা কত দিন সন্ধ্যার অবসর-বৈঠকে বসিয়া বলিতেন। একটা ঘটনার কথা এক দিন শুন্‌তে শুন্‌তে, আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে তীব্র উত্তেজনায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রতিকারের জন্য অন্তঃপুর-নিবাসিনী, চিরদুর্ব্বল, অসহায়া বাঙ্গালীর মেয়ের প্রতিহিংসাবৃত্তি চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তিমতী হইয়া জাগিয়া উঠিল। "এর কি কোন উপায় নাই? এ পাষণ্ডদের দণ্ড দিবার মত কি কেহই নাই? বলিয়া যখন উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলাম, তখন, আহা! আজও মনে হ'লে সমস্ত মনঃপ্রাণ যে ভক্তিভরে একান্তে তাঁর চরণ-প্রান্তে নত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। সে কি প্রগাঢ় স্নেহ, কি পবিত্র করুণা! বাবা ধীরে ধীরে আমার মাথার উপর তাঁর পরম-কল্যাণ-ভরা, আশীর্ব্বাদপূর্ণ হাত খানি, কত স্নেহে, কত আদরে, কত যত্নে সংস্থাপন করিয়া বলিলেন, "মা, মেঘমালা, অতখানি উত্তেজনা, অতখানি ক্রোধ বা প্রতিহিংসা প্রকাশ করা নারীজাতির পক্ষে মোটেই শোভা পায় না। একটা কথা ভেবে দেখ্‌বার আছে মা। আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত অত্যাচার, উৎপীড়ন হ'য়েছে, হচ্ছে, আর হ'বে, সকলের মূলে নিহিত আছে এক গূঢ় সত্য,—সেটা হচ্ছে কি জান? অত্যাচার হ'তে দেবার মত অবসর, অবকাশ দেওয়া। আর সব চেয়ে অপরাধ হ'চ্ছে সেখানে, যেখানে নিজেদের

কাপুরুষতা, নির্লজ্জ অহঙ্কারের আস্ফালনে গৌরব মনে করা। স্বামী হবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব, ভগবান সাক্ষী করে যাঁরা গ্রহণ করে থাকেন, বেশীর ভাগ দেখা যায়, তাঁদের সম্মুখেই নারীর প্রতি এই সব উৎপীড়ন, নির্য্যাতন ঘটিয়া থাকে। প'ড়েছ ত, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য কি অসাধ্যসাধন না করেছিলেন! দুষ্টের দমন নিজেকেই কর্‌তে হয়। পরের আশায় বসে থাক্‌লে অত্যাচার, বস্ত্রের ছিন্নাংশের মত দিন দিন বাড়িতেই থাকে! শেষে আর কোন উপায় হয় না।"

আমি বলিলাম, "আমার মনে হয় স্ত্রীলোকদেরও বিশেষ দোষ আছে। তারাও ত আত্মরক্ষা কর্‌তে পারে? বিলাতে ইংরাজ মহিলাগণ নানা দেশে একা ভ্রমণ করে থাকেন। সেখানেও দুষ্ট লোক আছে। কিন্তু তাদের প্রতি কেহ ঘৃণাক্ষরে কোন রূপ বিদ্রূপ কর্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করে থাকেন তারা নিজেরাই।"

"এটা দিনের আলোর মত সত্যি কথা বলেছ। এর বিরুদ্ধে কোন তর্কই টেঁক্‌তে পারে না। কিন্তু, একটা কথা ভুলে চ'ল্‌বে কেন মেঘ-মালা। সেটা হচ্ছে স্বাধীন জাতির দেশ। সেখানে সকলের সমান অধিকার। তার পর তাদের মতের সঙ্গে আমাদের মতের পর্ব্বতপ্রমাণ অনৈক্য থাক্‌লেও তারা সত্যিকার জানে কেমন করে নারীর সম্মান রক্ষা কর্‌তে হয়। আমরা মুখে যতই বড়াই করি না কেন, নারীর মর্য্যাদা, নারীর সম্মান রক্ষা করার মত প্রাণ পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। অনুভূতি যখন অতল বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যায় তখন লক্ষ ডাকেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। মরা মানুষ কি আর সমগ্র আত্মীয় স্বজনের করুণ-ক্রন্দনে সাড়া দেয় মা! আমরাই নারীকে জননী ভগবতীর অংশ বলে থাকি,

কিন্তু সেটা এখন মুখের কথায় দাঁড়িয়েছে। অন্তরে আমার মনে হয় তার স্থান অনুসন্ধান কর্‌লে পাওয়া খুবই দুষ্কর হবে।"

এমন সময় মা এসে খাবার জন্য সকলকে ডাক্‌লেন। এই খানেই সব কথা চাপা প'ড়ে গেল। আমাদের সান্ধ্য-বৈঠকে এমনইধারা কত আলোচনাই না হ'তো।

(২)

অপরেশ বাবু কন্যা মেঘমালাকে নিকট ডাকিয়া ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কিরে মালা"—তিনি আদর করিয়া অনেক সময় মেঘমালাকে 'মালা' বলিয়া সম্বোধন কর্‌তেন—"ঝাঝা" কেমন লাগ্‌ছে ?"

"আমার ত খুব ভালোই লাগ্‌ছে, বাবা। আজ পর্য্যন্ত যত জায়গায় গিয়েছি, এত কাছে পাহাড় কোথাও পাই নি! না, মা ?"

লীলাময়ী নিকটেই একখানি আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় "মানসী" পড়্‌ছিলেন, কন্যার আহ্বানে পুস্তক হ'তে চক্ষু না তুলিয়াই বল্লেন, "তা ঠিক।"

অপরেশ বাবু বল্লেন "তা, ঠিক কি! সম্পূর্ণ সত্য। এখানে শিকার কর্‌তে অন্যান্য জায়গার মত সেজে গুজে গরুরগাড়ী করে যেতে হয় না। কি বলিস্ মালা ?"

মেঘমালা বলিল, "কিন্তু শিকার কর্‌তে যেমন আমাদের দূরে যেতে হয় না, তেমনি যাদের শিকার করি, আমাদের শিকার কর্‌তে তাদেরও বড় দূর থেকে আস্‌তে হয় না। কাল কি হ'য়েছে জানেন, তা মা নিশ্চয়ই আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছেন।"

অপরেশ বাবু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কৈ, তেমন কিছু জান্‌বার মত কথা ত উনি আমাকে বলেন নাই। কি হ'য়েছিল রে ?"

"কাল আমাদের চাকর রঘুয়ার মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে বল্লে যে, তাদের একটা গাই বাঘে নিয়ে গেছে। আহা! বুড়ীর গরুর জন্য কি ভীষণ কান্না! কত বুঝিয়ে বল্লেম, যে বাঘ তোমার গরু নিয়ে গেছে সেটাকে আজ মারব। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জানালে, যে তাকে মেরে ত আর আমার গাই ফিরে আস্‌বে না। ববং তাদের রাগ আরো বেড়ে যাবে। মেরে কাজ নাই।"

বাবা বল্লেন, "দেখ্‌ছিস্‌ মালা, এঁদের গাই মেরেছে, কাল আবার মার্‌বে, হয় ত ক্রমে মানুষ মার্‌তে আরম্ভ কর্‌বে, তথাপি যদি কেউ সেই বাঘকে মার্‌তে চায়, তাতে মোটেই উৎসাহ ত দেখাবে না, বরং ভবিষ্যৎ অত্যাচারের আশঙ্কায় প্রাণপণে বাধা দেবে। অত্যাচাব সহিতে সহিতে মানুষের এমনি একটা সংস্কার হ'য়ে পড়ে যে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে মোটেই পারে না।"

"এ কথা খুব সত্যি। মার খেতে খেতে 'মার ঘেঁচড়া' হ'য়ে যায় যেমন, এও ঠিক তাই। অত্যাচার তখন সহজ হ'য়ে যায়। আমার মনে হয় এমনি করে যদি দেশের গতি আর কিছু দিন চলে, তবে এ জাতির আর কোন দিনই সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হ'য়ে উঠ্‌বে না।"

"তার আর সন্দেহ কি মা।"

"তা'বলে, বাবা, আপনি মনে কর্‌বেন না যেন, বুড়ীর কথা শুনে আমি গো-হত্যাকারী বাঘটাকে অমনি অমনি ছেড়ে দেব। আজই তাকে মার্‌বার আয়োজন কর্‌তে হবে।"

"বাঘ মার্তে পার্বি ? ভয় কর্বে না ! অনেক দিন ত বিয়ের পর বন্দুক ছুড়িস্ নি। আমার আশঙ্কা হয়, তোর সে অভ্যাস নাই মালা।"

"বিদ্যা একবার শিখ্লে তা কোন দিন কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ভোলা ত দূরের কথা বাবা।"

"তুই ত আমাকে চিঠিতে লিখেছিলি, যে তোর শ্বশুর না কি তোকে বঙ্কিমবাবুর "শ্রী" বলে ঠাট্টা করেছিলেন। পাড়ার মেয়েছেলেরা বন্দুক ছুড়িয়ে বৌ বলে তোমাকে রাগাত।"

"সত্যি বাবা, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে প্রথম প্রথম আমার খুব বাধ বাধ ঠেক্তে লাগ্ল। পড়াশুনার কথা নিয়ে গল্প কল্লে, তারা অবাক্ হ'য়ে আমার মুখের প্রতি চে'য়ে থাকৃত। মুখ টিপে টিপে হাস্ত। তাদের ধারণা মেয়েমানুষ হচ্ছে এমন একটা জীব, যে, কেবল রান্নাঘরের সীমার মধ্যেই মুখ বুঝে আবদ্ধ থাক্বে। হাঁড়ি, খুন্তি, কুটনা, বাটনা, বাসন মাজা, ঘরঝাট দেওয়া প্রভৃতি হচ্ছে মেয়েমানুষদের জীবনযাপনের প্রধান অবলম্বন। পড়াশুনা কল্লে মেয়েছেলে বিবি হয়ে যাবে। সংসারধর্ম্মে মন থাক্বে না। কিন্তু আমি যখন তাহাদের নিয়ে গল্প কর্তে বস্তাম, এবং এক একটা দেশের, এক একটা জাতের আচার ব্যবহারের কথা বুঝিয়ে দিতাম, তখন তারা যেন কাণ্ডারীহীন নৌকার মত কেবলই ঘুরিয়া মরিত। কিন্তু, বেশ বুঝ্তে পার্তাম, জানবার ও শোনবার মত আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে খুব আছে। কেবল অনুশীলনেরই অভাব।"

"তুমি কি তাদের মনে মনে ঘৃণা কর, মালা। মে'য়েদের এই অক্ষমতার জন্য তারা কি দায়ী মনে কর ? ঠিক শিক্ষা হয় না, যেমন

করে শিক্ষা দিলে নারী আত্মনির্ভর কর্‌বার শক্তিলাভ করে নারীর সম্মান ও মহিমা রক্ষা কর্‌তে পারে তা যে হয় না এ কথা পাঁচশো বার স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু, সে জন্য নারীকে অকর্ম্মণ্যা, অনুপযুক্তা, এ সব অন্যায় দোষারোপ কোন দিক দিয়ে করা চলে না। শিক্ষার মত শিক্ষা পেলে তারা জগতে অনেক বড় বড় কাজ কর্‌তে যে পারেন, তার রাশি রাশি প্রমাণ প্রতি দিন সভ্যজগতের সংবাদ রাখ্‌লে জান্‌তে পারা যায়। তুমি ত এ সব কথা জান, মালা ?"

"আমি কোন দিন তাদের ঘৃণা করি নি। বরং তাদের পড়ার নেশা ধরিয়ে দিয়েছি। এখন তারা আমাকে খুব ভালবাসে। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন একটা কাজ করে না। ভাল কথা, আমার শ্বশুর এখন আর আমাকে "শ্রী" বলে উপেক্ষা করেন না। সে বড় মজা হ'য়েছিল বাবা। এ কথাটা তোমাকে চিঠিতে লিখি নি, পাছে সে খানা কেউ দেখে ফেলে বলে।"

অপরেশ বাবু কন্যার মজার কথাটা শুনিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"তুমি ত ভারি শক্ত মেয়ে হয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি। মজার কথা চেপে রাখ্‌তে পার।"

"তা না পার্‌লে, তোমার কাছে এত দিন ধরে কি শিখ্‌লাম, বাবা।" কন্যার উত্তরে অপরেশবাবুর নয়নদ্বয় আনন্দ-গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি পরম স্নেহে কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন, "ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি—শ্বশুর-গৃহে তুমি যেন চির দিন শুকতারার মত সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাক মা। হ্যাঁ, মজার কথাটা কি এখন বল ত, শুনি।"

"আমার শ্বশুরের যে একটা বন্দুক আছে, এ কথা সে দিন ছাড়া পূর্ব্বে জান্‌তাম না। কোন দিন তিনি সেটাকে পরিষ্কার করা বা দরকারে বাহির কর্‌তেন না। এক দিন আমার ননদের বিয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখেন। সে দিন, রাত্রিতে ৪।৫ জন চোর আমাদের বাড়ীতে আসে। শ্বশুর জান্‌তে পেরে চীৎকার করে উঠেন। চাকর বাকর সব ভয়ে লুকিয়ে পড়্‌ল। শ্বশুর কি কর্‌বেন, ভেবে ঠিক কর্‌তে না পেরে, আমাকে ডেকে বল্লেন, 'বৌ-মা, শুনেছি তুমি না কি ভাল বন্দুক ছুড়্‌তে পার—এই বন্দুক নাও' বলে আমার হাতে বন্দুক দিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে বন্দুক নিয়ে যে দিকে গোল হচ্ছিল সে দিক লক্ষ্য করে চার পাঁচটা ফাঁকা আওয়াজ কর্‌লাম। চোরগুলা বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে পালিয়ে গেল। ধীরে ধীরে শ্বশুরের পায়ের কাছে বন্দুক রেখে প্রণাম করে যখন চলে আস্‌ছি তখন তিনি আমাকে নিকটে ডাকলেন, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন, 'তুমি সত্যি সত্যি আমাদের সংসারের "শ্রী"। তোমার মত গুণবতী-বৌ পেয়ে আজ ধন্য হ'য়েছি।' এ কথায় আমার বড় লজ্জা কর্‌তে লাগল; আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম।"

বাবা আমার কথা শু'নে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "সে দিন শশিশেখর বুঝি বাড়ী ছিল না।"

"তিনি আমার মামাশ্বাশুড়ীকে আন্‌তে গিয়েছিলেন।"

বাবা আর কোন কথা না বলে, চাকরকে ডেকে বল্‌লেন, "আমার বন্দুক দুটা এখানে নিয়ে আয় তো?" তার পর বাবা নিজের হাতে বন্দুক

সাফ্ করলেন। আমার হাতে একটী বন্দুক দিয়ে বল্লেন, "এটা খুব ভাল জিনিস। নূতন কিনেছি। তুমি এইটে নাও আর আমি পুরাণটা নেবো। আজ বাঘটা মার্তে হবে।"

পিতা-পুত্রী সে দিন শিকারের জন্য মহা উৎসাহে বাড়ী হইতে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিল। মেঘমালা মনে মনে ভাবিল রঘুয়ার মার গাইয়ের দুঃখ আজ সে দূর কর্বে।

(৩)

ছেলেবেলা থেকেই সকল শিক্ষার সঙ্গে বাবা আমাকে বন্দুক ছুড়্তে শিখিয়েছিলেন। তিনি শিকার করিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। আজও শিকারের নামে তার যৌবনের উৎসাহ নবীন হ'য়ে দেখা দেয়। শিকারের নামে তিনি একরূপ পাগল হইয়া উঠেন। যে কথাটা বলিবার জন্য এত কথা বল্ছি, তাহা আর লুকালে চলিবে না। আমি স্ত্রীলোক। হিন্দু-ঘরের মেয়ে ও বৌ। কিন্তু আমার কথা শুনে আমার উপর রাগ করিবেন না। ঘৃণা করিবেন না। বন্দুক ছোড়ার সখ্, শিকার করিবার আনন্দ আমার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। শিকারের কথা শুনিলে, অমনি তোড়-জোড় বেঁধে, সেজে-গুজে মহা উৎসাহে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়িতাম। বাবা ত আমাকে এ কাজে খুবই উৎসাহ দিতেন। মা বরং রাগ্ করিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, 'মেয়েমানুষের এ সকল নেশা বড় শোভা পায় না। লোকে শুন্লে বিয়ে হবে না। অন্যের প্রাণবধ করে তোমাদের যে কেমন আনন্দ হয় তা ত আমি বুঝ্তে পারি না?' মা অনেক বোঝাতেন তখন মনটা একটু নরম হত সত্য কিন্তু, শিকারের সময় সে সব উপদেশ কোনো কাজে আসিত না। বরং নূতন অভিযানের আনন্দে

আত্মহারা হ'য়ে পড়িতাম। কেমন করিয়া তন্দ্রালস হরিণীকে এক গুলিতে মারিব, তার অভিনব চিত্র নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। বিলম্ব অনেক সময় অসহ্য হইয়া পড়িত। তরুপল্লব ও লতাগুল্মের অন্তরালে যে পশু আপনাকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করিয়া পরম সুখে নিদ্রা যায় তাকে লক্ষ্য করে মারবার জন্য কি সন্তর্পণে, কি সতর্কে, কি ধীরে ধীরে, পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হওয়ার অপূর্ব্ব কৌশল! পদদলিত শুষ্ক পত্ররাজিগুলিকে নিষ্পেষণ করিয়া চলার মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে তাহাদের মরণের খড় খড় ক্ষীণ অভিব্যক্তিকে এনন ভাবে চেপে রাখিতে হইবে, যে বাতাসেও সে শব্দ যেন শুনিতে না পায়! এই সকল অনুষ্ঠান ও সতর্কতার ভিতর দিয়া সে এক অননুভূত আনন্দের রসাস্বাদ!

(৪)

যথা সময় শিকার করিয়া আমরা সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভার মধ্য বাসায় ফিরিলাম। একটা বাঘ মেরে এনেছিলাম। পথে অনেক লোক সেই ভীতি-সঞ্চারক মৃত বাঘটার অনেক দূরে দূরে আমাদের অনুসরণ করিতে আসিয়াছিল। একটা যেন মহা যুদ্ধ জয় করিয়া, বিজয় গর্ব্বে, উৎফুল্ল-অন্তরে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিলাম। শত শত লোকের প্রশংসা ও বহু প্রশ্নের দিকে আমরা মোটেই কান দিচ্ছিলাম না। মোটের উপর আমাদের বাসায় শুভাগমন যে সার্থক হইয়াছে, এমন কথাও অনেকে বল্‌ছিলেন। বাঘটা মারা পড়ায় যে গ্রামবাসীদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে এমন অভিমতও অনেকে অকপটে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল না। এই বাঘটাই না কি তাহাদের অনেকের ছাগল, ভেড়া, গরু নিয়া গিয়াছে। এরই ভয়ে তারা

সন্ত্রস্ত হ'য়েছিল। কিন্তু বাঘটা অবাধে এমন দৌরাত্ম্য অনেক দিন থেকে করে আস্‌ছে, কেউ তার প্রতীকার করার ব্যবস্থা করতে আজ পর্য্যন্ত পারে নাই, সাহসও করে নাই। সুতরাং আজ গ্রামের উপদ্রব দূর করে, বাঙ্গালী বাবু যে ভাল কাজ করেছেন, এটা তারা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার না করে পার্‌ছিল না। স্বীকার কর্‌তে গিয়ে সেই রক্তাক্ত মৃত বাঘটার প্রতি ঘন ঘন ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আরো একটু দূরে সরে গিয়ে চলছিল।

বাবা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলেন নাই। জনতার কথাবার্ত্তা শুনে বল্লেন, "দেখ্‌ছিস মালা প্রায় একশো লোক এই মৃত বাঘটার শাস্তি দেখে পরম সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কিন্তু, এদের মধ্যে এমন উৎসাহ বা চেষ্টা নাই, বা এরা ভাব্‌তে পারে না, যে এরা সকলে সমবেত হয়ে যদি লাঠি-সোটা নিয়ে এক দিন দৌরাত্ম্যের প্রতিকার কর্‌বার জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে উপস্থিত হ'য়ে বাঘটাকে মার্‌বার উদ্যোগ কর্‌ত তা হ'লে কবে এই উপদ্রব নিবারণ হ'তে পার্‌ত। কিন্তু, সে সাহস, সে বুদ্ধি, সে চেষ্টা মোটেই ইহাদের ভিতর নাই। ভগবানের দোহাই দিয়ে, প্রতিকারের প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দিন কাটানই হ'চ্ছে এদের অভ্যাস ও সংস্কার।"

"এদের ব্যবহার দেখে, আপনার কথা যে খুব সত্যি তাতে আর সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা আমার মনে হয়—এদের শক্তি আছে, সাহস আছে, এরা ইচ্ছা কর্‌লে নিজেদের উন্নতি কর্‌তে যে না পারে, তাও নয়; আসল কথা হ'চ্ছে, এদের শিক্ষা নাই, এদের সে শিক্ষা দেবার মত লোকও নাই। পথ না দেখিয়ে দিলে নূতন পথ চিনে যাওয়া সকলেরই

পক্ষে শক্ত। অজানা পথটা চিরদিনই আশঙ্কার পথ বলে মনে হবার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ থাক্‌তে পারে।"

"শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড় শক্তি, বড় সহায় একথা কে অস্বীকার করবে, মা! শিক্ষার অভাবেই ত অনেক জিনিস্ লোপ পেয়ে যে'তে বসেছে ও প্রতিদিন যাচ্ছে। বন্দুক ছোড়ার শিক্ষা না থাক্‌লে সে দিন, কি ডাকাতের হাত থেকে শ্বশুরকে রক্ষা করতে পার্‌তিস্?"

কথায় কথায় আমরা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হ'বামাত্র, সঙ্গীগণের কলরবে নীহারবালা, ও বিজলীকুমার বাড়ী হ'তে ছুটে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে আগে আগে চলিতে লাগিল। বিজলীকুমার আমাকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া কেবলই প্রশ্ন করিতেছিল, 'দিদি এই বাঘটা কি সেই রঘুয়ার মার গাই নিয়ে গিয়েছিল? গরীব মানুষের গাই মার্‌লে যে কি মজা এখন বাছা বেশ টের পাচ্ছেন।'

অপরেশ বাবু বিজলীর কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন। বল্লেন, "বাঘটা যে অনেকক্ষণ মরে গেছে। ওর কি আর মজা বোঝবার মত শক্তি আছে?"

বিজলীকুমার অপ্রতিভ হ'য়ে মৃদু হাসিয়া অপরেশ বাবু ও দিদির মুখের প্রতি জিজ্ঞাসু নয়নে উত্তর করিল, "একেবারেই ত মরে নি, মর্‌বার সময় বুঝেছিল, পরের গরু অকারণ মার্‌লে তার ফল এক দিন না এক দিন পেতেই হবে।"

এই সময় রঘুয়া কোথা থেকে ছুটে এসে মৃত বাঘটার উপর প্রাণপণ শক্তিতে এক ঘা লাঠি সজোরে বসিয়ে দিল। এই ব্যাপারে আমাদের অনুসরণকারী সঙ্গীরা ভয়ে এ ওর ঘাড়ে পড়্‌তে পড়্‌তে ছুটে পালাতে

লাগল। রঘুয়ার মা বুড়ী, হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে রঘুয়াকে মাতৃস্নেহে ভয়ব্যাকুল শীর্ণবক্ষের মধ্যে টানিয়া নিল এবং রঘুয়ার এই দুঃসাহসিকতার নিমিত্ত যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিল। পরে বলিল "গাই গিয়েছে, শেষ কি ছেলেটা পর্য্যন্ত বাঘের কোপে পড়ে প্রাণ হারাবে? বাবুরা ত আর এখানে বারমাস থাকতে আসেন্ নি। ওরা ওসব কাজ করলে ওদের ভয় না থাকতে পারে। আমরা গরীব দুঃখী মানুষ, আমাদের খেটে খেতে হয়—বাঘের সঙ্গে বিরোধ কি আমাদের উচিত" বলিয়া বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে দূর হ'তে মরা বাঘটাকে গলায় কাপড় দিয়ে ছেলের অপরাধের জন্য নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও রঘুয়াকেও করাইল।

বাবা অত্যন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে কেবল এক বার আমার মুখের প্রতি চাইয়া দেখিলেন। কোন কথা বল্লেন না। বিজলীকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কে বাঘটাকে মেরেছে, তুমি, না বাবা?"

অপরেশবাবু বলিলেন, "তোমার দিদির গুলিতে বাঘটা মরেছে?" মেঘমালা কোন উত্তর না দিয়া ছোট ভাইকে কোলে তুলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

(৫)

সে দিন, খোকা সকাল হইবার অনেক আগেই জাগিয়াছিল। নানাবিধ অসংলগ্ন প্রশ্নে আমাকেও ঘুমাতে দেয় নাই। তখনো বেশ একটু ঘোর অন্ধকার দূরে পাহাড়ের কোলে, তরুলতার মধ্যে জড়িয়ে আছে। প্রভাতের শুকতারাটি ম্লান হ'য়ে এসেছে। পূর্ব্ব দিকের আকাশের গায়ে খুব ভাল করে দেখিলে, যেন মনে হইতেছিল, একটা ঢাকাই মস্‌লিনের মত সূক্ষ্ম

আলোর পর্দ্দা মাঝে মাঝে, প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাসে দুলে উঠিতেছিল। ঘরের সম্মুখের ফুলের বাগান থেকে একটি সুমধুর, স্নিগ্ধ-গন্ধ খোলা জানালা দিয়ে এসে আমাদের শয্যার উপর লুটিয়ে পড়িতেছিল। দুই একটা দোয়েল বৌ-কথা-কও সাড়া দিয়ে প্রকৃতি রাণীর নিদ্রা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাবা প্রতি দিন সকালে আগে আসিয়া তার এই দুষ্ট ও সমজদার নাতিটির সহিত রসালাপ করিয়া তার পর বেড়াইতে বাহির হন। আজ তার দাদা মশাইয়ের আগেই সে উঠিয়াছে, এবং তাঁর সাড়ার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে ছটফট করিতেছিল। অন্ধকার বলে শয্যা হ'তে নামিবার মত সাহস কুলিয়ে উঠিতেছিল না। অবশেষে, সে ধরে বসিল যে, যে পাখীটা ডাকৃচে তাকে ধরে দিতে হবে। খোকার কথায় মনোযোগ না দিয়ে ভাব্ছিলাম, তিনি চিঠি দিলেন, পূজার পর একবার এখানে বেড়াতে আস্বেন, তার পর আর কোন খবর নাই! তিনি কারও জন্য ভাবেন না বলে, মনে করেন তার জন্য বুঝি কেউ ভাব্তে পারে না। ভারি মজার লোক! আমাকে খুব ভাবাতে পারেন। ভাবিয়ে তাঁর খুব সুখ হয় বুঝি? আমি আর চিঠি দেব না। দেখি. খোকার জন্য আস্তে হয় কি না? এমন সময় অপরেশবাবু লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন, 'মেঘমালা —এখনো বুঝি সুধাংশু ওঠে নি? আমার উত্তর দেবার আগেই খোকা বিছানা হ'তে নেমে ছুটে গিয়ে তার দাদা মশাইয়ের কোলে উঠে ক্ষুদ্র বাহু দিয়া গলা বেষ্টন করিয়া ধরিল। অপরেশবাবু নাতিকে আদর করিয়া যথারীতি বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর সকলেই বিশ্রাম করিতেছে। বাবার একটী বন্ধুর আজ সকালে কলিকাতা হইতে আসিবার কথা ছিল। তিনি না কি

খুব ভাল শিকারী। তিনি এলে আজ শিকারে যাবার সব স্থির হ'য়েছিল। সে জন্য আমি সাজ-সরঞ্জাম সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। মা আমাকে যাইতে দিবেন না বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। বন্দুক পরিষ্কার করিয়া আমার ঘরে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি। মনের মধ্যে একটা ভারি আনন্দ হইতেছে।

বাবার বন্ধুটির আসিবার বিলম্ব হইবার জন্য খুব রাগ হইতেছিল। কখন যে আসিবেন তার ঠিক নাই? একে একে কলিকাতা হ'তে সকল গাড়ি আসিয়া গেল। তাঁর দেখা নাই; এক বার মনে হইল হয় ত ষ্টেশনে নেমেছেন, কোন কারণে বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু গাড়ি ত প্রায় আধ ঘণ্টার উপর হইল ছাড়িয়া গিয়েছে। এতক্ষণ বিলম্ব হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? হয় ত কুলী পান নাই। সে জন্য দাঁড়াইয়া আছেন—কিন্তু রঘুয়া ত তাঁকে আনিতে গিয়েছে, তার মাথায় সব জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া তিনি কোন্ কালে চলিয়া আসিতে পারিতেন? হয় ত রঘুয়া বেটা তাঁকে চিনিতে না পেরে হাঁ করে কোন দিকে চেয়ে দাঁড়িয়া আছে—সে অত্যন্ত বোকা! তখন আমার মনে হইল, আমার গেলে হ'তো—কিন্তু এখন কি করা যায়? কি জ্বালায় পড়লুম! এ দিকে এত বেলা হ'য়ে গেল, কখন আর আজ শিকার করতে যাওয়া যাবে? না, আর কোন আশা নেই। তখন ঘর হ'তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে দূর পর্য্যন্ত ষ্টেশনের পথটি পরিষ্কার দেখা যায়—যদি রঘুয়ার মাথায় কোন ব্যাগ, বিছানা দেখা যায়। কিন্তু রঘুয়ার পরিবর্ত্তে অদূরে মুক্ত প্রান্তরের উপর এক পাল গরু মনের আনন্দে, শ্যামল তৃণের মধুর আস্বাদে অধীর হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড মহুয়া গাছের ছায়া-শীতল তলায় তিন চারিটি রাখাল বালক বসিয়া

গান করিতেছে। তাদের গানকে ছাপিয়ে নদীগর্ভ হ'তে রজকগণের কাপড় কাচায় একটু অত্যন্ত কৌতুকোদ্দীপক শব্দ নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শুনা যাচ্ছিল। মালগাড়ীর ইঞ্জিনগুলা সাইডিং-এ পড়ে, যাত্রীগাড়ীর ইঞ্জিনগুলার উপর ভীষণ চটিয়া মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করে মধ্যাহ্ন-আকাশ প্রকম্পিত করে তুল্‌ছিল। সমস্ত সুনীল আকাশটা উত্তপ্ত রৌদ্রের স্বর্ণকান্তিতে ঝল্‌মল্ কর্‌ছিল। আমার কিছুই ভাল লাগিল না। মনটা যেন কি একটা অজানা অভাবে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল—অভাবটা ঠিক যে কি তা নির্ণয় করা আমায় অসাধ্য হ'য়ে পড়্‌ল। বাবা তখন তাঁর ঘরে আহারান্তে শয্যায় শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন, মা কি একটা এক মনে বুন্‌ছিলেন। আমার ছোট্ট ভাই, একাগ্রচিত্তে কি একটা ছবি আঁক্‌ছিল। বাবার ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে এলাম। আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলাম খোকা অকাতরে ঘুমাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার মুখের উপর একটা স্বপ্নদৃষ্ট হাসির হিল্লোল উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছিল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার কোমল সুন্দর মুখখানির প্রতি চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম। এই ক্ষুদ্র শিশুর মুখ খানিকে পরিবেষ্টন করে বিধাতা বুঝি তাঁর সমস্ত সুষমা-সম্ভার নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই সময় একটা ঘুঘু অদূরবর্ত্তী একটা তালগাছের পত্রপুঞ্জের ছায়ায় বসে তার অকারণ চীৎকারে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকে উত্যক্ত করে তুলছিল। ঘু! ঘু!! ঘু!!! ভারি রাগ হ'চ্ছিল। এখনও রঘুয়া ফিরে এলো না কেন? আবার সেই গাছের অন্তরাল থেকে উঠিল ঘু! ঘু!! ঘু!!! বল্‌লাম,—দূর! দূর!! দূর!!!

মনে মনে বল্লাম,—কে মাথার দিব্যি দিয়ে এই ভরা দুপুর বেলায়

তোকে ডাকতে বলেছে। সে বড়ই একগুঁয়ে, বারণ মান্‌লে না। বরং তার চীৎকারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল, সে পুনরায় ডাক্‌লে— ঘু! ঘু!! ঘু!!! আমার অজ্ঞাতে আমার রাগের মাত্রাটা আমার সংযমের বাহিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি নি। মনটা পূর্ব্ব হ'তেই একরূপ যেন সারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। রঘুয়ার অযথা বিলম্ব যে এর একটা প্রধান কারণ, তা কোন দিক দিয়ে অস্বীকার করা চলে না। মনে করলাম সে এলে আজ তাকে বেশ দু'কথা কড়া কড়া করে শুনিয়ে দোব।

মেঘমালা জানিত না যে, তাঁর বাবার বন্ধুর নিকট হ'তে সকালে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, যে আগামী কল্য তিনি আসিবেন। রঘুয়া পোষ্ট আফিস হ'তে চিঠি ও টেলিগ্রাম আনিয়া, ছুটি লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তাদের বাড়ীতে আজ কি একটা পূজা আছে। যখন সে মনে মনে রঘুয়ার তিরস্কারের কঠিন ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতেছিল, তখন পত্রান্তরাল হ'তে অবুঝ ঘুঘুটা ডেকে উঠ্‌ল ঘু! ঘু! ঘু। মেঘমালার সমস্ত রোষ সহসা ওই নিরীহ ঘুঘুটার উপর জেগে উঠ্‌ল। অভিশপ্ত ঘুঘু যে কি কারণে সকলের অপ্রিয়, সে আজ পর্য্যন্ত তা জান্‌বার অধিকার পেলে না। তার ডাকে অমঙ্গল, তার বাসে অমঙ্গল, তার বেঁচে থাকাটাই যেন ধরার সমস্ত অমঙ্গল কুড়িয়ে জড়ো করে নিয়ে থাকে। এ সংস্কারের হাত থেকে শিক্ষিতা মেঘমালাও নিষ্কৃতি পায় নাই। সুতরাং এই মধ্যাহ্নে তার চিন্তায় বাধা দেওয়াকে সে সহ্য করিতে পারিল না। হাতের কাছেই শিকারের জন্য বন্দুক দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দেওয়া ছিল। মুহূর্ত্তের ভিতর বন্দুক তুলিয়া হাতে লইল এবং ঘুঘুটাকে লক্ষ্য করিল; ঠিক্ সেই

অবকাশে মরণ-পথের যাত্রী বুঝি তার শেষ ডাক ডেকেছিল, ঘু! ঘু! ঘু! তৃতীয় ডাক্. স্পষ্ট শোনা গেল না, সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের বক্ষের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ হ'লো গুড়ুম্। আর অমনি অদূরে শব্দ হ'লো ধড়াস্।

অপরেশবাবু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ালেন। তাঁহার মনে প্রশ্ন হইল কে এমন সময় বন্দুক ছুড়্‌লে? কে বুঝি ঐ ঘুঘুটাকে মারলে? মেঘমালার মা হাতের বোনা-কাজ ফেলে ভয়ব্যাকুলচিত্তে বাহিরে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইলেন—কেহ কোথাও নাই। কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। মুহূর্ত্তের জন্য নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি মথিত করিয়া নির্ম্মম মৃত্যু-লীলা কে সংঘটিত করিল? ব্যথিত অন্তরে তাঁরা ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কিছু যেন আর ভাল লাগিল না। এক বারও মনে হ'ল না এই মর্ম্মান্তিক নিদারুণ হত্যাকাণ্ড তারই কন্যা মেঘমালা করেছে বা কোন দিন করতে পারে?

ঘুঘুটা বন্দুকের গুলিতে যখন তার নিরাপদ আশ্রয় হ'তে ধরণীবক্ষে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়া পড়িল, তখন মেঘমালার প্রাণটা মুহূর্ত্তের জন্য কি জানি কেন একবার কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর সে বন্দুক রাখিয়া, জানালার লৌহগরাদ ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তার নিষ্ঠুর আচরণের কথা যে তার বাবা, মা, এখনও জানিতে পারেন নাই, এ কথাটা ভাবিতে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন লজ্জায়, ঘৃণায় ভেঙ্গে পড়িতেছিল। আজিকার এ কার্য্যের মধ্যে শিকারের সে আনন্দ নাই, সে উল্লাস নাই, সে মাদকতা নাই, এ যেন নারীর পবিত্রতা, ও লজ্জাকে জনসমাজে নির্লজ্জতার অপমানে পদদলিত করা হইয়াছে—ইহার

সাপক্ষে যেন কোন যুক্তিই দাঁড়াইবার মত কোন অধিকার খুঁজিয়া পাইতেছিল না। দুর্ব্বলের অভিশাপ যেন সারা বিশ্বের সহানুভূতিতে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

মেঘমালা প্রায় একরূপ টলিতে টলিতে ঘুঘুটার নিকট গেল। তাহার মনে হইল যদি কোন গতিকে তার প্রাণ বাঁচাতে পারে? রক্তাক্ত মৃত ঘুঘুটিকে নিজ বক্ষের মধ্যে প্রাণপণ আবেগ ভরে চাপিয়া ধরিল—কিন্তু কোন স্পন্দনই পাইল না। ঘুঘুটাকে সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া গৃহে আসিয়া খোকাকে প্রাণপণ শক্তিতে নিজ ব্যথিত বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। তখনও যেন বাতাসে অত্যন্ত কোমল ও মৃদু স্বরে ভাসিয়া আসিতেছিল ঘু! ঘু! ঘু!

(৬)

"দেখ, আমি আর এখানে কিছুতেই থাকতে পারব না। আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আজ তিন দিন হ'য়ে গেল কি করুণ হৃদয়বিদারক কান্না না কাঁদ্‌ছে ঐ ঘুঘুনী তার মৃত স্বামীর জন্য। সারা দিন ধরে মৃত স্বামীকে বেষ্টন করে তার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা-কাতর দীর্ঘশ্বাস না ফেলছে শোকাতুরা ঘুঘুনী। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। এত বড় নিষ্ঠুরের কাজ কি করে যে মেঘমালা কর্‌লে তা, ভাবতে লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর ভেঙ্গে পড়্‌ছে।"

অপরেশবাবু অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "এটা যে একটা খুব অন্যায় কাজ হ'য়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মালা এতটা উচ্ছৃঙ্খল হ'বে, এ কথা যে আমি মনে করতে কষ্ট অনুভব করি। এ

জায়গাটা ঐ ক্ষুদ্র পক্ষীর প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে বড়ই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সে যখন তার জীবনসঙ্গীকে ঘেরে তার ক্ষুদ্র অন্তরের সকল বেদনা ব্যাকুল-কণ্ঠে চীৎকার করে জানাতে প্রয়াস পায়, তখন আমার বুকের ভেতরটা যে কি করে উঠে, তা বোঝাতে পারা যায় না। দেখ্ছ ত সকল ভয়ের বাহিরে গিয়ে সে তার দুইখানি পাখা ও ঠোঁটের শক্তির উপর নির্ভর করে সকলকে অকুতোভয়ে তাড়া করে আসে, পাছে কেউ তার মৃত পতিকে নিয়ে যায়। কি গভীর প্রেম, কি বিচিত্র ভালবাসা ভগবান এই ক্ষুদ্র পাখীর হৃদয়ে ভরে দিয়েছেন, যা দেখ্লে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না!"

"কি কর্লে যে একে সান্ত্বনা দেওয়া যায় তা ভেবে পাওয়া যায় না, মানুষ নয় যে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব? কত দিন তোমাকে বলেছি মেয়ে মানুষের হাতে বন্দুক কোন দিন তার মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে পারে না। খেয়ালের বশে মেঘমালা যে অন্যায় কাজ করেছে জীবনের বিনিময়ে তা পরিশোধ করা অসাধ্য। পাখীটা আজ তিন দিন ধরে কিছু খায় নি, আমি খাবার ও জল ওর মুখের কাছে দিয়ে এসেছি সে ঠোঁট দিয়ে, পা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ও বুঝিবা স্বামীর দুঃখে জীবন বিসর্জ্জন দেবে।"

মেঘমালা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া, পিতামাতার কথোপকথন শুনি-তেছিল। তাহার নয়ন বহিয়া বেদনা-মথিত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে-ছিল। তাহার ব্যথিত অন্তরের অনুতাপ তাহার মনকে যে ভাবে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মারা খুব সহজ, কিন্তু বাঁচান যে একেবারেই যায় না, এ জ্ঞান মেঘমালার দুঃখকে আরো তীব্র ও নিবিড় করিয়া তুলিতেছিল। এ অন্যায়ের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই? দেয়ালের গায়ে

ঠেসান দেওয়া বন্দুকটার অসহ্য দৃশ্য যেন তার সর্ব্ব শরীরের মধ্যে একটা অসহনীয় জ্বালা জাগাইয়া তুলিতেছিল। সে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনার শেষ প্রান্তে কোন প্রকারে সে পৌছিতে পারিল না শত সহস্র ধিক্কারে নিজেকে কেবলই লাঞ্ছিত করিতে বাকি রাখিল না।

সহসা তার যেন মনে হইল কৈ স্বামী-হারা-ব্যথিতা-পক্ষিনী ত আর ডাক্‌ছে না? তার ত আর কোন সাড়া নাই—ত'বে কি তার করুণ ক্রন্দন শুনে, আহত পক্ষী বেঁচে উঠেছে? তবে কি ভগবান আমার নিবেদন শুনেছেন্? তার দয়িতের জন্য, বাঞ্ছিতের জন্য, প্রণয়ীব জন্য তবে সে নিশ্চয় বেঁচেছে, নতুবা আজ তিন দিন অবিশ্রান্ত যার মর্ম্মভেদী কাতর রোদন আকাশে, বাতাসে, নিয়ত আমাকে অভিসম্পাত করে ধ্বনিত হ'বে উঠ্‌ছিল—যে কাতরোক্তি শুনে বাবা, মা, আজ ক'দিন যে মর্ম্মাহত হ'য়ে রয়েছেন—তার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন? না, সে মরতে পারে না, যার এমন প্রণয়িনী সে কি মরতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে মেঘমালা, খোলা জানালাব নিকট উঠিয়া গিয়া গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া যে দিকে ঘুঘুটা পড়িয়াছিল, সেই দিকে এক দৃষ্টিতে অনিমেষ-নয়নে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। যদি এখনি তারা দু'জনে মুখোমুখি করে বসিতে পারে। কিন্তু তার আশা মিটিল না। কেহই মৃত্তিকাশয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠিল না। মেঘমালা আর ঘরের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সে ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই যেখানে ঘুঘুটা পড়েছিল সে দিকে যাইতে লাগিল।

কি আশাই না তার মনে জাগিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, 'যদি গিয়া দেখ্‌তে পাই ঘুঘু বেঁচে গিয়েছে, তা'হলে তাদের দুজনকে বাড়ীতে নিয়ে

এসে চিরদিনের জন্য রাখ্‌ব এবং আমার অপরাধের সাক্ষী বলে নিত্য ক্ষমা চাইবো।'

কিন্তু যেখানে ঘুঘুটা মরে পড়েছিল, সেখানে গিয়ে যা দেখিল তাতে মেঘমালার সমস্ত শরীর হিম-শীতল হ'য়ে আসিল। স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে, চিরমিলন-বন্ধনকে আঁক্‌ড়ে ধরেছে। স্বার্থপর মানুষের অত্যাচারে অনেক দূরে তারা চিরবিদায় গ্রহণ করেছে। মেঘমালা সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পার্‌লে না। ছুটে সে বাড়ী চলে এলো। অশ্রু-বিগলিত-নয়নে বন্দুকটি হাতে নিয়ে তার পিতার নিকট গিয়ে তাঁর পায়ের নিকট ধীরে ধীরে বন্দুকটি রেখে বল্‌লে, 'বাবা, আমাকে মাপ করুন, মা তোমার কথা না শুনে যে অন্যায় করেছি, সেজন্য আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলে দাও, আমি তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আর কোন দিন বন্দুক হাতে দিব না।' এই কথা বলিয়া মেঘমালা মায়ের পায়ে উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

ঠিক এই সময় বাহিরে পিয়ন ডাকিল—টেলিগ্রাম আছে। অপরেশ বাবু টেলিগ্রাম দেখিয়া বল্লেন, "আজি রাত্রিব গাড়ীতে বাড়ী যেতে হবে।" শশিশেখরের বড় শক্ত অসুখ।" মেঘমালা এ সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। গাড়িতে সে তার মায়েব পা ধরে বল্‌ছিল "মা"! তাব পর সমস্ত কথাই তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়া গেল, সে শুধু ব্যাকুল নয়নে অপরেশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পঞ্জাব মেল কাহারও মুখ না চাহিয়া, ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

সত্য রক্ষা

(১)

"আজ যে খুব সকাল সকাল ফিরে এলে ?"

"তোমার দেবতা 'সিন্নি' খেয়েছেন মিনতি—"বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন।

"আজ যে দেখ্‌ছি খুব খুসী ? একটা বক্‌সিস্ টক্‌সিস্ হবে না ? আমার দেবতা না হয় সিন্নি খেয়েছেন—ভরা অবশ্য ডোবাবেন না। মহাশয়ের দেবতা কি চপ্, কাট্‌লেট্ খেয়ে মাটিতে জুতো ঠুকছেন ; বলি, মহাশয় হেঁয়ালি ছাড়িয়া শাদা কথা বল্‌লে বোধ হয় বলার অগৌরব হ'বে না ? সংবাদটা কি শুন্‌তে পাই না ?"

"মিনতি এটা তোমার একটানা দোষ যে, তুমি আমাকে কেবল হেঁয়ালি বল্‌তেই শোন। কথার ভেতর যদি একটু ভাব না রইল তবে সে কথায় পান্‌সে দুধের মত—কোন স্বাদ থাকে না।"

"চলুক ! যত পার চালাও ; আমিও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে প্রস্তুত নই—দেখা যাক্ তর্ক শেষটা কোথায় গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরে।"

কলিকাতার বৌ-বাজার অঞ্চলের একটি দ্বিতল অট্টালিকায় এক খানি সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে বসিয়া স্বামীস্ত্রীর পূর্ব্বোক্ত রসালাপ চলিতেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতার ভিতর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার বেশ সুনাম ও খ্যাতি আছে। তিনি সুরসিক।

তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত সুখের। স্বামীস্ত্রীতে খুব প্রণয়। এক বৎসর হইল পুত্র সতীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া প্রবল পরাক্রমে স্নেহ-সিংহাসন খানির অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচত্র সম্রাট হইয়া বসিয়াছে।

সে দিন, সংবাদপত্রের স্তম্ভে মিনতি দেখিলেন, বড় বড় হরফে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে—

"গঙ্গা-সাগর যাইবার বিশেষ সুবিধা, মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"

বিজ্ঞাপন পড়িয়া তাঁহার কেবল মনে হইতেছিল পুরী অনেকবার গিয়াছি, সে কিন্তু, রেলে চড়িয়া। জাহাজে করিয়া যাইতে কিন্তু খুব আনন্দ হয়।

গঙ্গা-সাগরে যাইলে জাহাজে করিয়া যাইতে হইবে। যাইলে হয় না? মনে মনে স্থির করিল, তিনি আসিলে, তাঁহাকে এ বিষয় মত করাইতে হইবে। সে আজ পনর দিন পূর্ব্বের কথা। আজ কয়েক দিন ধরিয়া সত্যেন্দ্রের সহিত মিনতির এই বিষয় লইয়া ভীষণ আলোচনা ও তর্ক চলিতেছে। সত্যেন্দ্র ভিড়ের মধ্যে তীর্থ করিতে যাওয়ার বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নানারূপ অসুবিধা দেখাইয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিতে চাইতেছিলেন। মিনতি কিন্তু, সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবার মত মেয়ে নয়। তিনি জেদ ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন, "পৃথিবী-শুদ্ধ লোক যাইতে পারে, আর আমি যাইলে যত দোষ। সে হবে না—আমি যাবোই, একটা ব্যবস্থা কর।"

"যাহা হোক করা যাইবে।" বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধি-টাই উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় ঠিক্ করিয়াছিলেন। সেজন্য আজ কয়েক দিন যুদ্ধ স্থগিত আছে। সন্ধিপত্র এখনও স্বাক্ষর হয় নাই, লড়াইয়ের যথেষ্ট আশঙ্কা এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই আজ সত্যেন্দ্রনাথ যখন বাহির হইতে আসিয়া বলিলেন, "তোমার দেবতা সিন্নি খেয়েছেন" তখন মিনতির মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তবে কথাটা পরিষ্কার করিয়া স্বামীর মুখ হইতে শুনিতে চান। তাই হেঁয়ালির উল্লেখ করিয়া স্বামীকে বিদ্রূপ করিলেন।

সত্যেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সত্য মিনতি, তুমি ঠিক ধরেছ, আমার ঠাকুর চপ কাটলেট্ খেয়ে মাটিতে বুক ঠুকিয়া আজ কি বলেছেন শোন! সাহেবপুঙ্গব বলিলেন 'তুমি ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার। আজও তোমার মন হ'তে কুসংস্কার দূর হলো না? তুমি ভিড়ের ভয়ে, ব্যায়রামের ভয়ে, একটুখানি কষ্ট ভোগ করিবার সম্ভাবনায় কি না গঙ্গা-সাগরগামী লোকেদের জীবনরক্ষা করার জন্য যেতে চাও না? তোমার দেশের লোকের জন্য, আমরা বিদেশী হয়েও এত বন্দোবস্ত কর্‌ছি, আর তুমি তা'দের স্বদেশবাসী হয়ে যেতে চাচ্ছ না! ছো!'

"তুমি ত জান মিনতি, আমি তা'দের অপিসের মাহিনা-করা ডাক্তার। জোর করে যাব না বল্‌তে সাহস হ'ল না। দাসত্বের এমনি মহিমা!"

আমাকে নীরব দেখিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সময় নেই, আজ আমাকে সব ব্যবস্থা কর্‌তে হবে—যেতে পারবে কি না বল?"

"সাহেবের রক্ত-চক্ষুর সম্মুখে 'না' বলা গেল না, তাই বাধ্য হ'য়ে 'হ্যাঁ' বলে এসেছি। তোমার দেবতা সিন্নি খেয়েছেন, বুঝ্‌লে?"

(২)

আজ ভোর রাত্রিতে গঙ্গাসাগরে জাহাজ ছাড়িবে। মিনতি সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবু, ছোট ছেলে লইয়া মিনতির যাওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিনতির নিকট কোন যুক্তি সে বার টিকিল না। তিনি বলিলেন, "গঙ্গা-সাগর আমাকে টানিয়াছেন, আমার মনে হইতেছে, গঙ্গা-সাগর না যাইলে আমার অমঙ্গল হইবে। আমি যাইব-ই।"

অগত্যা মিনতির যাওয়া স্থির হইল। সত্যেন্দ্র আর আপত্তি করিলেন না।

সত্যেন্দ্র সাহেবকে বলিয়া একটি স্বতন্ত্র কেবিন বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। মিনতি মহানন্দে সতীশচন্দ্রকে কোলে করিয়া নির্দ্দিষ্ট কেবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যথাসময় জাহাজ ছাড়িল।

গঙ্গার দুকুলের শোভা দেখিতে দেখিতে, মিনতির মন একটা বিপুল পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। কেমন ধীরে ধীরে, গঙ্গা গেঁওখালীর পর চওড়া হইয়া পড়িল। নিকট হইতে অল্পে অল্পে, তীর যেন সরিয়া যাইতেছিল। নদীতটের উপরিস্থিত বড় বড় বৃক্ষরাজি ক্রমে ক্রমে ছোট, পরে অদৃশ্য হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে মিনতি দেখিলেন, আকাশে-জলে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এর পর বুঝি আর কিছু নাই! কোন অনন্তে তারা যেন আজ ভাসিয়া চলিয়াছেন। সীমা নাই! কূল নাই! শেষ নাই! মিনতি সতীশচন্দ্রকে কোলে

করিয়া কেবিনের জানালার নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সতীশকে বলিলেন, "সতীশ, কোথায় যাচ্ছি বল দেখি ?"

সতীশচন্দ্র কি বুঝিল, তাহা অবশ্য সে ভিন্ন কাহারও পক্ষে জানা অসাধ্য। তার কান ছিল ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দের উপর—আর তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনের উপর। সে জননীর কথায় বা আপন খেয়ালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল অনন্ত নীল আকাশের দিকে।

এই সময়, সত্যেন্দ্র মিনতির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, খোকাকে কি দেখাচ্ছ মিনতি ?"

মিনতি উত্তর করিলেন "আমরা কোথায় যাচ্ছি, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "মাতব্বর, সমজদার ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করা হ'য়েছে ? তিনি কি জবাব দিলেন ?"

"তা, তুমি সতীশচন্দ্রকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না ?" বলিয়া মিনতি সতীশকে সোহাগভরে স্বামীর কোলে দিলেন। সত্যেন্দ্র সতীশের মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "কিহে বিজ্ঞ সমালোচক, বল্‌তে পার আমরা কোথায় যাচ্ছি ?"

সতীশ তখন এক ঝাঁক পাখী জলের উপর উড়িতে দেখিয়া সে দিকে সে চাহিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া সেই দিকেই দেখাইয়া দিল।

সত্যেন্দ্র ও মিনতি দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। সত্যেন্দ্র বলিলেন, "মিনু, এবার জাহাজ সাগরে পড়্‌বে ? তুমি সাগর দেখ্‌তে ভালবাসো দেখ্‌ব কেমন সাহস ঢেউ দেখে হাঁপিয়ে উঠ কি না ?"

সাগর দেখিবার জন্য মিনতির আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল : গঙ্গাসাগর

সম্বন্ধে কত কথাই আজ তাহার মনে পড়িতেছিল। শুনিয়াছিল, একবার এক খানি জাহাজ ঝড়ে যাত্রীসহ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল—একটী প্রাণীও রক্ষা পায় নাই! কত শত নৌকাও সাগরে ডুবিয়াছে। এ কথা ভাবিতে সহসা ভয়ে তাঁর প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল! তিনি মনে মনে, দেবতাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। খানিক পরেই জাহাজ সাগরে পড়িল। সাগরে পড়িতেই, অত বড় জাহাজ নাচিয়া উঠিল। যাত্রীরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। বাতাসের স্কন্ধে চাপিয়া সে ধ্বনি বুঝি বা কপিলমুনির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে ছুটিল।

(৩)

সাগরে স্নান করিয়া আসিয়া মিনতি দেখিলেন, সতীশ কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তার মুখে হাসি নাই—সে হাত পা ছোড়া নাই। তিনি তাড়াতাড়ি সতীশকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুধ খায় নাই, তার পর জাহাজের দোল লাগিয়া বোধ হয় সে এমন হইয়া পড়িয়াছে। সতীশের মুখে এক ঝিনুক দুধ দিবামাত্র সে বমি করিয়া তুলিয়া ফেলিল। দুই মিনিটের পরে পুনরায় বমি করিতেই মিনতি বড় ভয় পাইল। এক জন খালাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "শীগ্গির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন। বলিস্ খোকাবাবুর বড় অসুখ এখনি আসুন।"

অদূরে এক খানি ফ্লাটের উপর ডাক্তারবাবু তখন রোগী দেখিতেছিলেন। পুত্রের অসুখের কথা শুনিবামাত্র তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ দিয়া প্রথমটা কোন কথা নিঃসরণ হইল না।

"মিনতি, সতীশের যে কলেরা হইয়াছে ?"

"বল কি ? কি হবে ?"

"ভগবানকে ডাক। ঔষধের বাক্সটা এখানে নিয়ে এসো।"

সত্যেন্দ্র সাধ্যমত ঔষধ দিল। কিন্তু রোগ বাড়িয়া চলিল। কোন প্রতিকার হইল না। ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিবার জন্য একটা ঔষধ তিনি বাক্সের মধ্যে অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু ঠিক সেই ঔষধটা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। এরূপ ভুল ত তাঁ'র কোন দিন হয় নাই। তখন সত্যেন্দ্র একরূপ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিলেন। নিজ পুত্রের ব্যাধির কথা বলিয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য একখানি 'লঞ্চ' চাহিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "দেখ্‌ছেন ত, কি গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কাজ কর্‌তে হচ্ছে। উপায় থাক্‌লে আপনার ছেলের জন্য লঞ্চ ছেড়ে দিতে পার্‌তাম। আমাকে ডাক্তারবাবু ক্ষমা কর্‌বেন, আমি হৃদয়হীন নই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার ছেলে সেরে উঠুক। এখন আপনি কি কর্‌বেন মনে করেছেন ?"

"এক খানা নৌকা করে বেরিয়ে যাব। ডায়মণ্ড হারবার থেকে রেল ধরে যদি ততক্ষণ"—আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

(৪)

দাঁড়িদের ডাকিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা যদি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাকে ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে দিতে পার, একশো টাকা বক্‌শিস্‌ দিব। সত্যেন্দ্র

মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সেখানে একবার কোনপ্রকারে যাইতে পারিলে, হাঁসপাতাল্ হইতে নিশ্চয় ঔষধ পাইব।

দাঁড়িরা বলিল,—বাবু, আমাদের টাকার লোভ দেখাবেন না। আমরা ছোট লোক, দাঁড়ি হ'লেও মনে রাখ্‌বেন আমাদের ছেলে-মেয়ে আছে। আপনার ও মাঠাকৃরুণের যে কি হ'চ্ছে, তা, বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের প্রাণ দিয়ে নৌকা নিয়ে যাব, কিন্তু দেবতা রাজি হ'লেই হয়।"

দাঁড়িরা প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানিতে লাগিল। এই দম্পতীর মর্ম্ম-বেদনা তাহাদের অন্তর ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। মিনতি যখন ব্যাকুল কাতরদৃষ্টিতে মাঝির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আর কত দূর বাকী আছে বাবা?" সে কথাগুলি যেন মাঝির অন্তস্তলে গিয়া বিঁধিল।

সতীশ এবার যেন অসাড় হইয়া পড়িল। সর্ব্ব অঙ্গ যেন তার শীতল ও স্থির হইয়া আসিতেছিল। প্রচুর পরিমাণে ঘাম হইতেছিল। সত্যেন্দ্র খুব ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ বুঝ্‌লাম আমার ডাক্তারী শিক্ষার কোন মূল্য নাই! নিজের ছেলের যে প্রাণরক্ষা করতে পারে না, সে কেমন করিয়া পরের জীবন রক্ষা করবার স্পর্দ্ধা করে?"

মিনতি বলিলেন, "কি দেখ্‌লে? সতীশ কি বাঁচ্‌বে না? সতীশ, সতীশ, বাবা! কি কর্‌লি!" বলিয়া তিনি স্বামীর কোলের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

সত্যেন্দ্র দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ! কোন প্রকারে মিনতির সংজ্ঞা আনয়ন করিলেন। তার পর বলিলেন, "তুমি যদি এত অধৈর্য্য হও, তা হ'লে সতীশকে কেমন করে রক্ষা কর্‌বে বল?"

মিনতি মনে মনে, অনেক ঠাকুরের কাছে সতীশের জীবন রক্ষার জন্য

সম্ভব অসম্ভব মানসিক করিতে লাগিলেন। সহসা তাহার সুপ্ত-স্মৃতি মথিত করিয়া একটা অতীতের স্মৃতি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে—পাওনাদারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও নির্ম্মমতা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র মিনতির বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। স্বামীর পা দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো! আমি জীবনে কখন সত্য-ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু একটী সত্য আমার মনে ছিল না। তাই আজ সেই পাপে, আমাদের আদরের সতীশ আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে! এ যে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! তখন কি জানি, শৈশবের বালিকা-সুলভ সেই ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞা এক দিন এমন নির্ম্মম হ'য়ে দেখা দিতে পারে? একটা অপরিণত বয়সের কল্পনা, যে এমন করে বেড়ে উঠ্‌তে পারে এবং সে যে এমনি করে তার পরিসমাপ্তি করতে পারে, তা বোঝ্‌বার মত বুদ্ধি ত তখন আমার ছিল না।"

সত্যেন্দ্র মিনতিকে উন্মাদিনীর মত এত কথা কোন দিন বলিতে শোনেন নাই। তাঁহার ভয় হইল, পাছে পুত্রশোকে মিনতির মস্তিষ্ক না বিকৃত হইয়া যায়!

সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি মিনতিকে নিজ বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মিনতি তুমি কি ব'লছ? ভগবানের দান, যদি তিনি নেন, তাতে তোমার আমার কি হাত আছে বল? তুমি যে কি বলছ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না!"

"তুমি স্বামী, তুমি দেবতা, তোমার কাছে কোন দিন, কোন কথা গোপন করি নি। ছেলেবেলার সব গল্পই তোমার নিকট অতি তুচ্ছ হ'লেও —আমার কাছে সেগুলা বহু মূল্যবান মনে করে, কত দিন তোমাকে শুনি-

য়েছি। কিন্তু একটা কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এক দিন খেলা ঘরে খেলা কর্‌তে কর্‌তে, পাকা গিন্নির মত কত অভিনয়ই করা হ'তো, সে দিন আমি আমার সইকে বলেছিলাম, আমার প্রথম ছেলে বা মেয়ে যা হবে তাই সাগরে দিব। কথাটা মনে থাক্‌লে, হয়ত আমি সাগরে আস্‌তে ভয় পেতাম।"

"বুঝেছি! দেখ্‌ছি একটা ক্ষুদ্র সঙ্কল্পও বিনা সিদ্ধিতে লয় হয় না মিনতি।"

"আমাকে ক্ষমা কর। না বুঝে, এমন মতিভ্রম আমার ঘটেছিল। সত্য-ভঙ্গের পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "ভগবান যখন তাঁর দান তোমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমার সত্যকে বড় কর্‌তে চান, তখন এই যে প্রবল তরঙ্গ উন্মাদের মত ছুটে আস্‌ছে, এর মধ্যে নিশ্চয় আমাদের নৌকা ডুবে যাবে—তোমার সত্য পালন হবে!" কিন্তু মাঝি কৌশলে এবারও সে তরঙ্গের মুখ হইতে নৌকা বাঁচাইল। নৌকা ডুবিল না। সকলে সাগরের জয়-ধ্বনি দিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, "বাবু এ জায়গাটা বড় ভয়ানক। সাগরের মুখ! এখানটা একবার কোন গতিকে পার হ'তে পার্‌লে আর ভয় নাই।"

হঠাৎ একটা মেঘ আকাশে দেখা দিল, বাতাস উঠিল। সাগর ভয়াল-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ নৌকাখানিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার জন্য সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এবার কিন্তু মাঝি ভয় পাইল। বলিল, "বাবু একটু সাবধান হবেন। ভগবানকে ডাকুন, তিনি না রক্ষা কর্‌লে, আর উপায় দেখ্‌ছি না। এটা হচ্ছে পরীক্ষা

স্থান। সাগরের কাছে কোন দিন যদি কোন সত্য করে থাকেন, তা না পালন করলে, আমার জীবনে, অনেকবার দেখেছি, সাগর এমন করে রেগে উঠেন।”

মিনতির অত্যন্ত ভয় হইল। ভাবিলেন, আমার জন্য কি আজ এত গুলি নিরীহ প্রাণীর প্রাণ যাইবে? তা কিছুতেই হইতে পারে না। বিদ্যুৎ-গতিতে সে সতীশকে দুই হাতের উপর তুলিয়া ছুটিয়া নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন একটা প্রকাণ্ড ঢেউ লাফাইতে লাফাইতে সে দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, দাঁড়ি-মাঝি এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, “নৌকা গেল, গেল,।” সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া মিনতিকে দুই হাতে জড়াইয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। নৌকার উপর দিয়া তরঙ্গ চলিয়া গেল, নৌকা ডুবিল না সত্য, কিন্তু সতীশ নাই। ভক্তের দান ভগবান গ্রহণ করিয়াছেন।

মিনতির কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। মাঝি বলিল, “নৌকা আস্তে টান—এক জন দাঁড়ি পড়ে গেছে।”

সহসা যেন কোন যাদুমন্ত্রে সাগর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। একটি তরঙ্গের মাথার উপর দাঁড়ি যেন উঠিয়া বসিয়াছে। সেই দিকে নৌকা পরিচালিত করা হইল; সত্যেন্দ্র যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে মিনতি অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় ঢেউ দাঁড়িটাকে নৌকার অনেক খানি নিকটে আনিল। নৌকা হইতে মাঝি একটি দড়ী ফেলিয়া দিল। দাঁড়ি দড়ি ধরিয়া নৌকায় আসিয়া উঠিল, সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিল দাঁড়ি সতীশকে ভীষণ তরঙ্গের সহিত লড়াই করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে।

মিনতির কাছে সতীশকে দিয়ে সে বলিল, "ছেলে পড়ে গেছে দেখে যেমন আমি ঢেউয়ের উপর পড়্লাম, তখনি যেন কে আমার হাতে খোকাকে তুলে দিলে, আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্ল। আমার গা যেন এখনও ছম্ ছম্ কর্‌ছে।"

সতীশ বোধ হয় সমুদ্রের জল খাইয়াছিল, বা যে কোন কারণে হউক, সে সারিয়া উঠিল। মিনতির যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি চারিদিকে চাহিতেই, সত্যেন্দ্র বলিলেন, "সতীশ যে তোমাকে খুঁজ্‌ছে?" মিনতির আগাগোড়া যেন একটা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। সতীশ তখন হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। নৌকা সাগর পার হইয়া গঙ্গার মুখে পড়িয়াছে।

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "ভাগ্যে সাগরে এসেছিলে মিনু, তাই আমার সতীশকে ফিরে পেলাম—আর তোমারও সত্য-রক্ষা হ'লো।"

মিনতি সতীশের মুখ চুম্বন করিয়া স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "আর তোমার ডাক্তারীবিদ্যারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল!"